হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তরপুরুষেরা

ডঃ বলরাম চক্রবর্তী

স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন
২৪/২/১৯, মণ্ডলপাড়া লেন
কলিকাতা-৭০০০৫০

প্রকাশন :—

স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন
২৪/২/১৯, মণ্ডল পাড়া লেন
কলিকাতা-৭০০০৫০

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

মুদ্রাকর :—

সাগরিকা প্রেস
৯, এ্যাণ্টনি বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

---

* পরিশিষ্টে কর্ণাটক বিষয়ক লিপি প্রমাণ দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

* স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থে বঙ্গের সেন রাজাদের দিল্লীকে রাজত্ব করার বিবরণ আছে। পরবর্তী খণ্ডে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

দেবী কালিকার মূর্তিকলার উদ্ভব ও দেশান্তর ও যুগান্তরে তার রূপান্তর।

পরিশিষ্ট (ক)

ভূমিকা

হিমাচলে ভারতীয় জাতি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আত্মনিমজ্জনে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হুণ দল, পাঠান মুঘল
একদেহে হল লীন" ॥ ?

এই প্রাচীন দেশের সুপ্রাচীন বংশগুলির মধ্যে যে কোন একটি বংশের ইতিহাসের কিছুটা পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ও ভাষার এবং ধর্ম মতের মানুষের আত্মনিমজ্জনে সেই বংশ সমৃদ্ধ। দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার জন্য সেই বংশধারা প্রান্তিকতা ছাড়িয়ে জাতীয়তার স্তরে উঠতে সক্ষম হয়েছে—ভারতীয়রূপে আত্ম পরিচয় দেবার যোগ্য হয়ে উঠেছে। রামায়ণের রঘুবংশ বা মহাভারতের কুরুবংশের সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য—তেমনি সত্য কল্হন্ রচিত কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিনী', অথবা বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত আসামের 'দরংরাজ—বংশাবলী' সম্বন্ধে। এযুগের সেন বংশের সম্বন্ধে যে একথা সত্য তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সেন রাজারা শুধু বঙ্গদেশের নন— শুধু হিমাচল প্রদেশের নন, কয়েক পুরুষ সুদূর কর্ণাটকের ও অধিবাসী ছিলেন। তাই এই সেন বংশ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম সব প্রান্তেরই উত্তরাধিকার সম্পন্ন একটি ভারতীয় রাজবংশ। বঙ্গদেশের পাঠকদের কাছে বাংলার সেন রাজারা— বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি সুপরিচিত কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা— যেমন রূপ সেন, বীর সেন শৌর্যে ও মহত্ত্বে মহীয়ান হলেও তেমন সুপরিচিত নন তেমনি আবার হিমাচল প্রদেশের পাঠকদের কাছে বীর সেন ও তাঁর পরবর্তী সেন রাজারা, যাঁরা হিমাচলে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের ইতিহাস সুপরিজ্ঞাত হলেও তাঁদের পূর্বপুরুষ লক্ষ্মণসেন, বল্লাল সেন প্রভৃতির ইতিহাস তেমন সুপরিচিত নয়। এই পুস্তকটির নামে 'লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষদের' কথা থাকলেও এটি শুধু সেন রাজাদের জন্ম মৃত্যু বিবাহ, যুদ্ধ অভিযান ও জয় পরাজয় ইত্যাদির কাহিনীই নয়— সেন রাজাদের সঙ্গে যে সব বাঙালী রাজকবি, কবিরাজ তথা রাজ-বৈদ্য, রাজ-জ্যোতিষী, সভাপণ্ডিত, রাজ পুরোহিত হিমাচলে গিয়েছিলেন তাঁদেরও সাধনার

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার নিদর্শন যে সব অনবদ্য সৃষ্টি, মন্দির, মূর্তিকলা, কৃষ্টি, তাল পাতার ও তুলোটকাগজের পুঁথি রেখে গেছেন তারও কিছু বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে সাধারণ বাঙালী অর্থাৎ সেন রাজানুগামী সাধারণ প্রজাদের সামাজিক রীতি রেওয়াজ, তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি হিমাচল বাসী প্রজাদের জীবন শৈলীর সঙ্গে মিশে যে 'বাংলা-হিমাচলী' মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে তার উপরেও গবেষণার সূত্রপাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

আবার মাণ্ডীর সেন রাজবংশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট শুধু বঙ্গদেশে ও হিমাচল প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সেন রাজারা বঙ্গদেশে এসেছিলেন সুদূর কর্ণাটক থেকে সেখানকার অনুচর ও জীবন শৈলী সঙ্গে নিয়ে। তাঁদের সঙ্গে বঙ্গ সংস্কৃতির সংযোগ সাধনে গড়ে ওঠে এক সমৃদ্ধতর বঙ্গ সংস্কৃতি। তাই এই ইতিহাস শুধু সেন বংশের ইতিহাস নয়—এ হল পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জাতি ও ধর্মের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা ভারত ইতিহাসের একটি সমৃদ্ধ অধ্যায়।

সেন রাজত্বকালে অনেক জ্ঞানী গুণী, ও প্রতিভাধর লেখক ও পণ্ডিত তাঁদের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের—'মিতাক্ষরা' স্মৃতি যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অনুসৃত হত তখন বাঙালীদের জন্য বিশেষ স্মৃতি 'দায় ভাগ' রচনা করেছিলেন সেন সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় জীমূতবাহন। এছাড়া ও তিনি লিখেছিলেন 'ব্যবহার মাত্রিকা', "কালবিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থ। বল্লাল সেনের গুরু ধর্মাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন 'হারলতা' এবং 'পিতৃদয়িতা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। বল্লাল সেন নিজেও একাধিক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করে-ছিলেন। তার মধ্যে 'দানসাগর', ও অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ দুটি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর লেখা 'আচার সাগর' ও 'প্রতিষ্ঠা সাগর' বঙ্গদেশে আজও পাওয়া যায় নি। হয়ত, হিমাচলে তাঁর উত্তর পুরুষদের সংগ্রহ থেকে এগুলি আবিষ্কৃত হতে পারে। লক্ষ্মণ সেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ ভারত বিশ্রুত পণ্ডিত হলায়ুধ রচনা করেছিলেন 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', 'মীমাংসা সর্বস্ব', 'বৈষ্ণব সর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' ও 'পণ্ডিতসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ। সেন রাজ সভার পঞ্চরত্ন বলা হত শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধনাচার্য, উমাপতিধর এবং জয়দেব এই পঞ্চকবিকে। শরণদেবের 'সদুক্তি কর্ণামৃত', ধোয়ীর পবনদূতম, উমাপতি ধরের চন্দ্রচূড়চরিত ও দেওপাড়া প্রশস্তি, মাধাইনগর লিপি প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ শ্লোকগুলি, গোবর্ধনাচার্যের আর্যা সপ্তশতী ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সেন যুগের অমূল্য কাব্য সম্পদ।

একমাত্র 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' ছাড়া হলায়ুধের 'মীমাংসা সর্বস্ব' প্রভৃতি পুঁথিগুলি বঙ্গ-

দেশে লুপ্ত। হলায়ুধের ভাই পশুপতি রচনা করেছিলেন পাকযন্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এছাড়াও আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, জ্যোতিষ, অস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন সেনরাজ সভার এই সব বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা।[২]

বাঙালী পণ্ডিতদের হিমাচলে গমন

এইসব পণ্ডিত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ও পুরোহিতদের বেশ কিছু সংখ্যক লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র শূর সেনের অনুগামী হয়ে প্রয়াগে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শূর সেনের পুত্র রূপসেনের সঙ্গে তাঁরা যান পাঞ্জাবের রোপাড়ে। সেখান থেকে আবার ১২১১ খৃষ্টাব্দে রূপসেনের পুত্র বীর সেনের সঙ্গে তাঁরা গিয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশের সুকেতে। তাঁদের উত্তরাধিকারীরা আজও বসবাস করেছেন হিমাচলের সুকেত ও মাণ্ডির বিভিন্ন স্থানে।

কানিংহাম কিন্তু বীরসেন যে বঙ্গদেশের লক্ষ্মণসেনের উত্তরপুরুষ এবং তিনি যে ১২১১ খৃষ্টাব্দে সুকেত রাজ্যে এসে সেনরাজ্য স্থাপন করেন এই মত সমর্থন করেন নি। তিনি মনে করেন সেনরাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। তিনি নির্মাণ্ডের পরশুরাম মন্দিরে যে তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তার উপরে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এই তাম্রশাসনে দেখা যায় স্পিতিতে 'সেন' পদবীধারী রাজারা রাজত্ব করতেন। এই তাম্রশাসনে দাতার পরিচয়ে বলা হয়েছে যে তিনি স্পিতিরাজ বরুণসেনের প্রপৌত্র সঞ্জয় সেনের পৌত্র এবং রবিসেনের পুত্র সমুদ্র সেন। লিপিশৈলীর বিচারে এই তাম্রশাসন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। কানিংহাম বঙ্গের লক্ষ্মণ সেনের উত্তরাধিকারী সমুদ্র সেনকে ও নির্মাণ্ডে তাম্রশাসনের সমুদ্র সেনকে একই ব্যক্তি মনে করেন—যদিও তাঁদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম পৃথক। এই ভুলের জন্য কানিংহাম সেন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল ১২১১ খৃষ্টাব্দের পরিবর্তে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্বাচন করেছেন। ডঃ হাচিনসন ও কানিংহামের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন। কিন্তু "A History of Mandi State"-এর লেখক অধ্যাপক মনমোহন মনে করেন—মাণ্ডির সেন রাজারা লক্ষ্মণ সেনের বংশধর এবং তাঁরা সুকেতে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন ১২১১ খৃষ্টাব্দেই।

এই মতবিরোধের এবার অবসান ঘটেছে। মাণ্ডির সেন রাজারা এবং তাঁদের

বেশ কিছু অনুগামী যে বঙ্গদেশ থেকে গিয়েছিলেন তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ পুঁথি যার বেশ কয়েকটি সংগ্রহ করেছেন শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ তাঁর 'হিমাচল লোক সংস্কৃতি'র সংগ্রহ শালায়।

সেন রাজাদের বাঙালী অনুগামীরা হিমাচল প্রদেশে যাওয়ার পর স্থানীয় হিন্দী ভাষী পরিবারে বিবাহাদি করতে থাকেন। স্থানীয় বধূরা বাঙলা ভাষা ও লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাই এইসব বাঙালী রাজানুগামীদের পরিবারে ক্রমশঃ বাঙলা ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষা ও বাঙলা অক্ষরের পরিবর্তে দেবনাগরী অক্ষর প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু রাজবৈদ্যদের ঘরে এখনও থেকে গেছে প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃতের বিভিন্ন পুঁথি। তেমনি আবার প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা জ্যোতিষের পুঁথি আছে রাজ জ্যোতিষীদের ঘরে। আর প্রাচীন বাংলা হরফে লেখা সংস্কৃত পূজা পদ্ধতির বই পাওয়া যাবে রাজপুরোহিতদের বংশধরদের ঘরে।

১৯৯০ খৃষ্টাব্দে ঘরের আবর্জনা পরিষ্কার করার সময় এমনি কতকগুলি প্রাচীন বাঙলা হরফে লেখা সংস্কৃত পুঁথি ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন জনৈক রাজানুগামী বাঙালীর হিন্দী ভাষী উত্তরপুরুষ। তিনি প্রাচীন বাঙলা অক্ষর পড়তে না পারায় পুঁথিগুলি নিরর্থক ও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ভারস্বরূপ মনে করেছিলেন। এমন সময় শ্রী রেবতী রমণ শর্মা নামে জনৈক ব্যক্তি তাঁকে নিরস্ত করেন এবং সেগুলি উদ্ধার করে তিনি শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপকে দেন। শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ হলেন মাণ্ডির বিজয় উচ্চবিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি কিছু দিন আগে থেকেই পুঁথিপত্র সংগ্রহ করছিলেন এবং ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথি মাণ্ডি ও সুন্দর নগরের গৃহস্থদের ঘর থেকে সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে প্রাচীন বাংলা অক্ষরে তালপাতায় লেখা সংস্কৃত পুঁথিও কিছু আছে। এই সব ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ 'হিমাচল লোক সংস্কৃতি সংস্থান' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মাণ্ডির পুরাতন রাজপ্রাসাদে একটি কক্ষ তাঁর সংগ্রহশালারূপে পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এই জীর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলি সংরক্ষণের কোন সম্যক্ ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। প্রাচীন বাঙলা অক্ষরের ত্রয়োদশ শতাব্দী ও তার পূর্বেকার লেখা এইসব তালপাতা ও তুলোট কাগজের পুঁথিগুলি অত্যন্ত জরাজীর্ণ। এগুলির অতি সত্বর ল্যামিনেশন (Lamination) এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ

ব্যবস্থার প্রয়োজন। শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্যের তুলোট কাগজের লেখা 'দুর্গা পূজা-তত্ত্বম্' পুঁথি ও 'বৈদ্য কল্পতরু' প্রভৃতি পুঁথির পৃষ্ঠার প্রতিলিপি পরিশেষে দেওয়া হল। এই পুঁথিগুলি এবং অন্যান্য অনেক তুলোট কাগজ ও তালপাতার পুঁথি 'হিমাচল লোক সংস্কৃতি সংস্থানে'র সংগ্রহশালায় শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপের কাছে দেখতে পাওয়া যাবে। এই পুঁথিগুলির বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য গত আট দশ বছর ধরে শ্রী কাশ্যপ, সরকারের বিভিন্ন আধিকারিক ও প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়ে আসছেন। এই পুঁথিগুলি সংরক্ষণের বিষয়টি গ্রন্থকার মাণ্ডির তৎকালীন জেলাধীশ ও হিমাচল প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি অধিকর্তাকে জানিয়েছিলেন এবং শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ তাঁর ৩।৯।৯৩ তারিখের পত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনার ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদককেও পত্র লিখেছেন। কিন্তু তাঁরা নিরুত্তর। হিমাচল সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের 'রুটিন' উত্তর পেয়েছেন—সংস্থাটি রেজেষ্ট্রি হ'লে তবেই তাকে সরকারী অনুদান দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু সংস্থাটি যে এই উত্তর লেখার এক বৎসর আগে ৩।৩।৯২ তারিখে রেজেষ্ট্রিকৃত হয়েছে তার কোন খবরই তাঁরা রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। সংস্কৃতি সংরক্ষণের সেই পত্রটির অনুলিপি পরিশেষে সংযোজিত হ'ল। শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ একজন সত্তর বৎসর বয়স্ক অবসর প্রাপ্ত বিশীর্ণ স্কুল শিক্ষক তাঁর চেয়েও জীর্ণতর এই পুঁথিগুলি নিয়ে অপেক্ষা করছেন।—'কর্মচারী'রা কবে 'কর্মী' হয়ে উঠবেন হিমাচল, বঙ্গদেশও কর্ণাটকের ইতিহাসের এই উপাদানগুলি রক্ষায় তৎপরও যত্নবান হবেন—এই আশায়। তাঁর আশা অবিলম্বে সফল হবে কি?

মানবিক মূল্যবোধ

প্রাচীনকালের রাজতন্ত্রেও তখনকার রাজপুরুষ ও সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য ও মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রের জন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ রেখে গেছেন বিষ্ণু শর্মা তাঁর পঞ্চতন্ত্রের 'বীরবর-উপাখ্যানে'। সম্ভবতঃ সেটি উপাখ্যান মাত্র। কিন্তু বাস্তবজীবনে রাজপুরুষদের অন্যায় অবিচার ও তার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থীর প্রতি সুবিচার ও দণ্ডদানে রাজশক্তির দীর্ঘসূত্রতার বিরুদ্ধে রাজ্যের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ও সভাসদেরা কেমন করে নির্ভীক প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেন ও ন্যায় ও ধর্মকে রক্ষা করতে পারেন—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভার গোবর্ধনাচার্যের মত তেজস্বী সভাসদ ও উপদেষ্টারা।

এই গ্রন্থে সে ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা থেকে এযুগের স্বার্থ-ভীরু ও চাটুকারিতায় অভ্যস্ত রাজপুরুষও এই নির্ভীকতার নিদর্শনে কর্তব্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন এবং ন্যায়নীতি সুবিচার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারেন।

এই গ্রন্থটির কিয়দংশ 'তিরিষা' পত্রিকায় ২য় বর্ষ ১ম—সংখ্যা ২৫শে বৈশাখ ১৪০১ থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া বিশ্ব-সংস্কৃত সম্মেলনে এবং বিভিন্ন সেমিনারে ও সভা সমিতিতেও গ্রন্থকার বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

১৪০০ সালের গোড়ায় 'তিরিষা' পত্রিকার সম্পাদক বর্তমান লেখককে একটি প্রবন্ধ দেবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে হিমাচল প্রদেশে প্রাপ্ত বাংলা সংস্কৃতির কিছু উপাদান সংরক্ষণের বিষয়ে একটি লেখার তিনি সুধী সমাজে সত্বর প্রচার চান। তাঁর "হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রতিশ্রুত অগ্রিম টাকা দিতে না পারায় অপ্রকাশিত হ'য়ে পড়ে আছে। কিন্তু সেন আমলে রচিত বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় সে পুথিগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা ঐ পাণ্ডুলিপিতে বন্দী হয়ে পড়ে আছে তা সুধী সমাজে পৌছে দেওয়া খুবই জরুরী। 'তিরিষা' পত্রিকার সম্পাদক বাংলার এই সাংস্কৃতিক সামগ্রী সংরক্ষণের বার্তা সত্বর প্রকাশ করবেন এবং এ বিষয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত করবেন এই আশ্বাস দেওয়ায় লেখক এই গ্রন্থের প্রকাশনার জন্য যাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন সেই স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশনকে 'তিরিষার' সম্পাদকের কাছে এই পুস্তকের প্রথমাংশের পাণ্ডুলিপি ও বাংলা হরফে লেখা দুটি সংস্কৃত পুঁথির শেষ পৃষ্ঠার ফটোকপিও পৌছে দিতে বলেন—'তিরিষা' সম্পাদক ঐ পৃষ্ঠা দুটিরও ব্লক করে ছাপানোর জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৪০০ সালে 'তিরিষা' পত্রিকার কোন সংখ্যাতে লেখাটি প্রকাশিত না হয়ে দুর্বোধ্য বিলম্বের শিকার হয়েছিল। পরে ১৪০১ সালে তার কিয়দংশ এমন বিকৃতরূপে প্রকাশিত হল যে তার অনেক প্রয়োজনীয় অংশেরই মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না! বাংলা হরপে সংস্কৃত পুঁথির পাতা দুটির প্রতিলিপিও প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি। যার ফলে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টিতে দৃষ্টান্তের অভাবও রয়ে গেল। হতাশ হয়ে লেখক পাণ্ডুলিপি ও পাতা দুটির ফটোকপি ফেরৎ চেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি ফেরৎও পাননি। 'তিরিষা' পত্রিকার উল্লিখিত পৃষ্ঠাগুলির দুই একটি নমুনা পরিশিষ্টে ছাপা হ'ল যাতে

পরবর্তীকালে প্রয়োজন হ'লে গবেষকেরা এই অস্বাভাবিক মুদ্রণ বিকৃতি ও বিলম্বাদির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন।

বর্তমান লেখক কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সংসাধন-বিকাশ মন্ত্রালয়ের আঞ্চলিক উপদেষ্টার পদ থেকে অবসর পেয়েছিলেন ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর অবসরকালীন পেনসনাদি প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেবার জন্য সেণ্ট্রাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও ঐ মন্ত্রকের কিছু কর্মচারী লেখকের প্রাপ্য টাকা না মিটিয়ে তাঁকে দীর্ঘকাল অনটনের নিগড়ে বন্দী করে রেখেছিলেন। লেখকের সৃজনী প্রতিভা ও চিন্তা ভাবনা অবরুদ্ধ হয়েছিল অত্যাচারী কংসের কারাগারে। ফলে লেখকের রচিত গ্রন্থগুলি এবং দেশ ও মানুষ গড়ার প্রকল্পগুলি অঙ্কুরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল—কংসের কারাগারে বন্দী বসুদেব ও দেবকীর সন্তানদের বারংবার ধ্বংস হবার মত। এই গ্রন্থটি কোন ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের মতো সেই নিগড় থেকে বেরিয়ে গেলেও রাক্ষসী পুতনার ছলনা ও আক্রমণের কবলে একে পড়তে হ'য়েছিল।

অবশেষে নন্দগোপ, যশোমতী ও যাদব সখাদের মত যত্ন, নিষ্ঠা ও ভালবাসায় এই গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করে প্রকাশ করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন সেই সাগরিকা প্রেসকে এবং বিশেষ ক'রে শ্রীঅশোক রায়কে সুন্দর মুদ্রণের জন্য এবং স্বনির্ভরতা সমিতির উৎসাহী কর্মিবৃন্দকে গ্রন্থটির সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনের জন্য জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ!

ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, অধ্যাপক মনমোহন প্রভৃতি পূর্বসূরীদের গবেষণা ও গ্রন্থ অনেকক্ষেত্রেই সাহায্য করেছে। হিমাচলের 'সেন রাজপরিবার' এবং 'হিমাচল লোক সংস্কৃতি সংস্থানের শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ আমাকে সাহায্য করেছেন সেকালের কিছু তৈলচিত্র, পুঁথি, লেখ ও অন্যান্য পাথুরে প্রমাণের হদিস দিয়ে—তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বলরাম চক্রবর্তী

হিমাচল প্রদেশে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

সেন রাজবংশ তথা ভারতীয় যে কোন রাজবংশের ইতিহাস লেখকেরা রাজাদের বংশ তালিকায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী পূর্ব পুরুষের উল্লেখ অবশ্যই করে থাকেন। কলিযুগ ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারত উপমহাদেশের তখনকার প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজবংশই কৌরব ও পাণ্ডবদের কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের বংশধরেরা স্বভাবতঃই মহাভারতের যুদ্ধে তাঁদের পূর্ব পুরুষেদের কীর্তি থেকে বংশ গৌরব অনুভব করে থাকেন। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশের রাজা নন্দীবর্মণ মহাভারতের অন্যতম সেনা নায়ক অশ্বত্থামার বংশধর বলে স্বীয় বংশ পরিচয় উৎকীর্ণ করে গেছেন তাঁর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর ভেলুরপালায়াম তাম্রলিপিতে। এইভাবে মহাভারত ও পুরাণ-গুলি ভারতের বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির আত্ম পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করেছিল। এমন কি কহ্লন তাঁর কাশ্মীর রাজাদের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' লেখার বহু পূর্বে—কাশ্মীরের নাগজাতির প্রখ্যাত মহামুনি নীল কাশ্মীর দেশ ও তার রাজাদের নিয়ে—যে 'নীলমত পুরাণম্' রচনা করেছিলেন—তাতেও মহাভারতের যুদ্ধে কাশ্মীর রাজাদের পঞ্জীকরণ হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন তুলেছেন। কেন না 'ভারতীয়তার' এবং ক্ষাত্রবীর্য ও মূল্যবোধের নিরীখ বা কষ্টি পাথর ছিল মহাভারতের 'ধর্মযুদ্ধে বীর কীর্তি' ও ধর্মকে গ্লানিমুক্ত রাখার জন্য কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ।

নীল্মত পুরাণম্ শুরু হয়েছে বৈশম্পায়ণ ও জন্মেজয়ের কথোপকথন দিয়ে। জন্মেজয় ব্যাসদেবের শিষ্য ঋষি বৈশম্পায়ণকে প্রশ্ন করলেন :—মহাভারতের কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে কাশ্মীর রাজ অংশ গ্রহণ করেন নি কেন?

"মহাভারত সংগ্রামে নানা দেশ্যা নরাধিপাঃ।
মহাশূরাঃ সমায়াতাঃ পিতৃনাং মে মহাত্মনাম॥
কথং কাশ্মীরিকো রাজা নায়াতস্তত্র কীর্তয়।
পাণ্ডবৈধার্ত রাষ্ট্রৈশ্চ ন বৃতঃ স কথং নৃপঃ"!

উত্তরে বৈশম্পায়ণ বললেন : মহাভারতের যুদ্ধের মাত্র কয়েক বছর আগেই কাশ্মীরের রাজা গোনন্দ তাঁর মিত্র জরাসন্ধের পক্ষাবলম্বন করে যাদবদের বিরুদ্ধে মথুরাতে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পরে

সিংহাসনে আরোহন করেন কাশ্মীরের যুবরাজ দামোদর। তিনি পিতৃহত্যার উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন। ইতিমধ্যে তিনি শুনলেন যে, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গান্ধার দেশে এক স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তাঁর চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে গান্ধার দেশে গিয়ে তাঁকে অবরোধ ও আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হল না—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে দামোদর পরাজিত ও নিহত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুলে পালিত হলেও জন্মসূত্রে ছিলেন নাগ বংশীয়। কাশ্মীরের একটি নাগ রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এটা তিনি চান নি। তিনি অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষে কাশ্মীর রাজ্যের গুরুত্ব এবং সেখানকার রাজনীতিতে স্থিরতা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য নিজে শ্রীনগরে এলেন এবং অন্তঃসত্তা রাণী যশোমতীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। যথা সময়ে রাণীর গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে 'বালগোনন্দ' নামে কাশ্মীরের রাজা হন। কিন্তু মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় রাজকুমার 'বালগোনন্দ' অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় পাণ্ডব বা কৌরব কোন পক্ষই তাঁকে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগ দিতে ডাকেন নি।

মহাভারতের যুদ্ধের কাল নির্ণয়

মহাভারতের যুদ্ধের তারিখ সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রাচীন লেখে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল ৫৫৬ শকাব্দের মহীশূরের আইহোলের লেখ। তাতে বলা হয়েছে যে মহাভারতের যুদ্ধের ৩৭৩৫ বছর পরে এই আইহোলের লেখটি লেখা হয়েছে। লেখ অনুযায়ী গণনা করলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ হবে ৩১০২ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ এবং এই তারিখে আর্যভট্টের মতে কলিযুগের প্রারম্ভ হয়েছিল। কিন্তু বরাহমিহিরের মতে মহাভারতের যুদ্ধ কলিযুগের প্রারম্ভের ৬৫৩ বছর পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ ২৪৪৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাশ্মীরের রাজ তরঙ্গিনী রচয়িতা কল্‌হন্ এই মতের অনুসরণ করেন।

এছাড়া পুরাণে মহাভারতের বীর অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের জন্মের তারিখ থেকে মহাপদ্মনন্দের মগধের সিংহাসনে আরোহণের তারিখের ব্যবধান এক সহস্র পঞ্চশতবর্ষ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কোথাও কোথাও "পঞ্চশত"-র স্থলে পঞ্চদশ এইরূপ পাঠও পাওয়া যায়। তখনকার নিজের হাতে লেখা পুঁথির লেখকেরা তারিখ সম্বন্ধে যত্নবান না হওয়ায় পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মহা-পদ্মনন্দের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানের হিসাব তিনরকম হয়ে

দাঁড়িয়েছে। যথা—১৫০০ বছর, ১০৫০ বছর ও ১০১৫ বছর। অর্থাৎ পুরাণের মত অনুযায়ী মহাভারতের যুদ্ধ ১৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় অনুষ্ঠিত হয়।

পুরাণে মহাভারতের যুদ্ধ থেকে মহা পদ্মনন্দের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত তিনটি রাজবংশের পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলি হল (১) বৃহদ্রথ, (২) প্রদ্যোত এবং (৩) শিশুনাগবংশ। পুরাণে সময় পঞ্জী অনুযায়ী এই তিন রাজবংশ যথাক্রমে ১০০০, ১৩৮ এবং ৩৬০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই হিসাব থেকে অনেকে হয় পরীক্ষিতের জন্ম সন থেকে মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনে আরোহণের ব্যবধান এক সহস্র পঞ্চ শতবর্ষ হওয়াই অধিকতর সমীচিন মনে করেন।

এইভাবে দেখা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক লেখে মহাভারতের যুদ্ধকে ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ত বলা হলেও পুরাণের মতে তা ১৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলা হয়।

মাণ্ডিতে প্রাপ্ত বংশাবলী থেকে জানা যায় মহাভারতের সময় থেকে সুকেতে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর সেন পর্যন্ত ১৬১ জন রাজা কর্ণাটক, বঙ্গ, প্রয়াগ, পাঞ্জাব ও হিমাচলে তাঁদের অনুগত প্রজাদের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বীর সেন মাণ্ডিতে সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২১১ খৃষ্টাব্দে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ১২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩১০২ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ৪৩১৩ বৎসরে ১৬১ পুরুষ রাজত্ব করেছিলেন। তাহলে প্রতি পুরুষের রাজত্ব কাল গড়ে ২৬ বছর। মহাভারতের যুদ্ধের সাল ১৯০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হলে বীর সেনের মাণ্ডিরাজ্য স্থাপনের ব্যবধান কাল হল ৩১১১ বছর এবং ১৬১ জন পুরুষ যদি এই সময়ের মধ্যে রাজত্ব করতে থাকেন তাহলে প্রত্যেকের গড় রাজত্ব কাল হবে ১৯ বছর।

আমাদের সুপরিচিত সেন রাজাদের অনেকেই লক্ষ্মণ সেনের মত দীর্ঘজীবি ছিলেন। আবার রূপ সেনের মত কেউ কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন। তাই তাঁদের গড় রাজত্ব কাল ২৬ অথবা ১৯ উভয় সংখ্যাই হতে পারে। আমরা পুরাণে লিপিকারদের প্রমাদ বশতঃ পাঠান্তর ও সংশয় দেখায়, পাথুরে প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক লেখের প্রমাণের উপর নির্ভর করব।

সেন রাজত্বে কর্ণাটক বঙ্গ সংস্কৃতির সম্মিলন

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গের সেন রাজবংশের আদি পুরুষেরা কর্ণাটকের "কোঙ্কণ" অঞ্চল থেকে বঙ্গ দেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন কর্ণাটকের রীতিনীতি, পূজা পদ্ধতি, ক্রীড়াকৌতুক, রন্ধন প্রণালী ইত্যাদি যা ক্রমশঃ বাংলার স্থানীয় রীতিনীতির সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সেই সময়ে উন্মেষ ঘটে একটি সমৃদ্ধতর বঙ্গ সংস্কৃতির। বঙ্গদেশের পৌষ পার্বণের 'আসকে পিঠা' ও 'সরু চাকলি পিঠা' কর্ণাটকী নিত্য প্রাতঃরাশের 'ইটলি'—'দোসারই' নামান্তর। এখানকার ছেলেমেয়েদের চোখ বেঁধে যে 'কানামাছি' খেলা, তা কোঙ্কণের অনুরূপ চোখ বেঁধে খেলা 'কন্নুমপ্পুচি' (কন্নু=চোখ, পুচি=বাঁধা)-র'ই বাংলা সংস্করণ।

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম যখন বঙ্গদেশের হিন্দু ধর্মকে প্রায় ম্রিয়মান করে এনেছিল সেই সময়ে হিন্দু ধর্মের সংরক্ষণও সংবর্ধনের জন্য আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় দেবী দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি পার্শ্বদেবতার সমাবেশ করে দুর্গোৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেন সেন রাজারা। এই পূজা উপলক্ষে উৎসব ও মণ্ডপ সজ্জার জন্য ও যথেষ্ট অর্থব্যয় করতেন তাঁরা। দীন-দরিদ্র ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পুরোহিত দিকে এই সময় প্রচুর দানধ্যান করতেন। মহানবমীর দিনে রাজা ও সৈন্য সামন্তেরা সকলে 'শান্তিবারি' গ্রহণ করতেন পূজা-মণ্ডপ থেকে। আর্যাবর্তের কর্মবাদী আর্যরা যখন অগ্নিতে সমিধ ও হবি অর্পণ করে যাগযজ্ঞ করতেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে—তখন দাক্ষিণাত্যের ভক্তিবাদীরা পুষ্প বিন্যাসে সাজাতেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অর্চনা করতেন তাঁদের ইষ্ট দেবদেবীকে।

দাক্ষিণাত্যের সর্প দেবী 'মঞ্চাম্মা' বঙ্গদেশে 'মা-মনসা' নামে পূজা পাচ্ছেন। বঙ্গদেশের মনসা দেবী'র উপাখ্যানের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সর্পদেবী অম্বাবরুর কাহিনীর আশ্চর্য মিল পাওয়া যায়। বাংলায় যে পূজা কথাটি অবিরত ব্যবহৃত হয় তাও এসেছে দাক্ষিণাত্য থেকে। তামিল ভাষায় 'পু' মানে পুষ্প এবং 'চৈ' মানে সঙ্গে বা সহকারে। 'পুচৈ'—'পুজৈ'—দাক্ষিণাত্যের 'পূজা' অর্থাৎ পুষ্প-সহকারে যা করা হয়।

হিমাচল ও বঙ্গ সংস্কৃতির সম্মিলন

এই মিশ্র ও সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতি লক্ষণ সেনের উত্তর পুরুষেরা 'সুকেত' তথা মাণ্ডিতে নিয়ে যান। সে যুগে হিমাচলবাসীরা অধিকাংশই ছিলেন শিবভক্ত আর

বাঙালীরা ছিলেন সাধারণতঃ শক্তি উপাসক। বঙ্গ দেশ হয়ে উঠেছিল শক্তি সাধনার পীঠস্থান—দেবী কালিকার ক্ষেত্র। আন্নাস্তোত্র রচয়িতা বিভিন্ন শক্তি পীঠের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—

"কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী
বারণস্যাম্ অন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী"।

সেন রাজাদের অনুগামীরা যখন হিমাচলে গমন করেন তখন তাঁরা বঙ্গদেশের শক্তি সাধনার ধারাটিও সঙ্গে নিয়ে যান। সেন রাজারা নিজেরা অবশ্য গোড়ার দিকে শাক্ত ছিলেন না। বিজয় সেন ও বল্লাল সেন ছিলেন শিবভক্ত—'পরম মাহেশ্বর'। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব "পরম নারসিংহ"। তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব ছিলেন 'সৌর' অর্থাৎ সূর্য পূজক। কিন্তু হিমাচল প্রদেশে শ্যাম সেন প্রভৃতি তাঁদের উত্তর পুরুষেরা দেবী কালিকাকে নিজ নিজ ইষ্ট দেবীরূপে শ্যামা কালী'—ইত্যাদি অভিধায় কালী মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবী কালিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে মাণ্ডিও বঙ্গদেশের মতই একটি শক্তি পীঠে পরিণত হয়ে উঠে। দেবী কালিকার মূর্তিকলার উদ্ভবক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে পরিশিষ্টে।

'স্পিতির সেন রাজবংশ'

শতাব্দীর একটি তাম্রলিপিতে স্পিতির নির্মাণ্ডের পরশুরাম মন্দিরের সপ্তম যে রাজা সমুদ্র সেনের কথা লেখা আছে বা তাঁর পূর্বপুরুষ রবি সেন, সঞ্জয় সেন ও বরুণ সেন প্রভৃতির উল্লেখ আছে—তাঁরা এলেন কোথা থেকে? 'সেন' পদবীটির মানেই বা কী?

কেউ কেউ মনে করেন 'সেন' কথাটি এসেছে প্রাক বৌদ্ধ বন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেনরাব (gSenrab) এই নাম থেকে। সেনরাবের শিষ্য ও বংশধরদের পরিচয় হয় 'সেন'। 'সেন' কথাটির মানে হলো জ্ঞানী ভিষক (medicine man) বা বৈদ্য। সেন রাব্ প্রতিষ্ঠিত বন ধর্মের আদি দেবতা হলেন সদাশিব (Kuntu-zangpo) এবং দেবী হলেন ত্রিভুবনেশ্বরী (Sisumgyemo)। কৈলাস মানস সরোবর এলাকায় থাকার সময় এই সেনেরা সেখানকার স্থানীয় তিব্বতী ভাষায় তান্ত্রিক গ্রন্থও রচনা করেন।[৩]

দ্বাদশ খণ্ডের ঐ বৃহৎ গ্রন্থটির নাম 'উজ্জ্বল মহিম্ন সূত্র সংগ্রহ'। বা সংক্ষেপে 'মহিম্ন' (gzibrjid)—তিব্বতীয় উচ্চারণ (জি জি) মাঝারী

আকারের আর একটি তিব্বতী গ্রন্থ 'জেরমিগ' (gZermig) এবং ক্ষুদ্রাকৃতির একটি পুস্তক দোদ্দু: (m Do-hdus) হলো বন ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থে তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতির সঙ্গে রোগ নির্ণয় ইত্যাদি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। তার কিছু পরিচয় আছে বর্তমান লেখকের Cultural History of Bhutan-এর প্রথম খণ্ডে। এই বন্ সেনরাব শিষ্যদেরই একটি গোষ্ঠী সম্ভবত স্পিতিতে সপ্তম, অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন যাঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে নিমাণ্ড লিপিতে। হয়তো তার বহু আগে এই সেনদেরই অপর একটি গোষ্ঠী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধোত্তর কালে তাঁরা দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নেন এবং কর্ণাটকে তাঁদের নতুন রাজ্য স্থাপন করেন। এই অনুমানের সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে বঙ্গদেশের সেন রাজারা বৈষ্ণব বা সৌর হলেও যে 'সদাশিবকে' (Kuntuzangpo) কুলদেবতারূপে পূজা করতেন, তার মুদ্রা ও লিপি প্রমাণ বিদ্যমান। এই 'সদাশিবই' কি সেনরাবের বন ধর্মের Kuntuzangpo ? সেন রাজারা কি হিমালয়ে (কৈলাস মানস সরোবর) থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর দক্ষিণ ভারতে (কর্ণাটকে) গিয়ে আবার পরে বীরসেনের সময় পিতৃভূমি হিমালয়ে ফিরে এসেছিলেন। আকাশ থেকে মেঘ ঘনীভূত হয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। পাহাড় বেয়ে সমতলে নেমে নদী হয়ে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে—কিন্তু আবার তা সূর্যের তাপে বাষ্প হয়ে পুনরুত্থিত হয়ে মেঘ হয়ে ফিরে আসে আকাশে।

আকাশাৎ পতিতংতোয়ম্
পুনরাকাশমভিগচ্ছতি—

সেন বংশ কি সেইরকম হিমালয়ের সুউচ্চ স্পিতি অঞ্চল থেকে দক্ষিণ ভারতে নেমে এসেছিলেন—আবার সেখান থেকে নানান উত্থান পতনের সুখ দুঃখ সন্তাপের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আবার ফিরে এসেছিলেন তাঁদের প্রাচীন আলয় পিতৃভূমি সুউচ্চ হিমাচলপ্রদেশের মাণ্ডি অঞ্চলে ? হিমালয় নন্দিনী গঙ্গার তীরের প্রতি একটা প্রাণের টান অনুভব করতেন সেন রাজারা ! সেইটানেই সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে কর্ণাটক ছেড়ে ভাগীরথী তীরে এসে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেনও তাঁর রাজধানী বিক্রমপুর (জয়স্কন্ধাবার) ছেড়ে অধিকাংশ সময় বসবাস করতেন নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে। শূরসেনকে যখন স্বরাজ্য ছেড়ে পশ্চিম

মুখে চলে আসতে হয়েছিল তিনিও প্রথম আশ্রয় নির্বাচন করেছিলেন প্রয়াগে—গঙ্গাতীরেই।

পরে রূপনগর হয়ে হিমাচলে তাঁরা পৌছলেন হয়ত পিতৃভূমির কোন এক অদৃশ্য অজ্ঞাত আকর্ষণে। শীতের আগন্তুক খেচর পাখীরাও হয়ত এমনি কোন অদৃশ্য অজ্ঞাত আকর্ষণে গ্রীষ্মের শুরুতে ফিরে যায় তাদের পিতৃভূমির অরণ্যের বৃক্ষশাখায়।

কর্ণাটক থেকে বঙ্গদেশ

সেন রাজারা কবে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসেছিলেন তা নিয়ে ভিন্ন শিলালিপিতে ভিন্ন মত আছে। একটি শিলালিপি থেকে মনে হয় সামন্তসেনই প্রথম বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়ের গঙ্গাতীরে বসবাস করতে আসেন। কিন্তু নৈহাটীর লিপি থেকে জানা যায় সামন্তসেনের পূর্বেও সেন বংশধরেরা বঙ্গদেশে এসে বসবাস করেছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে (১০৫৫—১০৭০) কর্ণাটকের চালুক্যেরা উত্তরাপথে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হন। 'বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত' রচয়িতা লিখে গেছেন কর্ণাটকের চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের রাজত্বকালে। তাঁর পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হন এবং গৌড়, মগধ ও নেপাল প্রভৃতি জয় করেন ; চালুক্য লিপিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এইসব কর্ণাটক দেশীয় সমরাভিযানের সঙ্গে সৈন্য ও সেনাপতিরূপে কিছু কর্ণাটক দেশীয় ক্ষত্রিয় সামন্ত পরিবার ও রাজকর্মচারী বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং নগর ও দুর্গ অধিকৃত হলে তার সুরক্ষার জন্য রক্ষী, প্রশাসক এবং প্রশাসন কর্মীরূপে তাঁরা সৈন্যাভিযান কর্ণাটকে ফিরে যাওয়ার পরও এদেশে থেকে গিয়েছিলেন। কর্ণাটকের কোন কোন সামন্ত সম্ভবতঃ পাল রাজসভায় কাজ করতেন যাঁরা সামন্ত সেন ও বিজয় সেনকে সেন রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সেনবংশীয়রা কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন। এই বংশের সামন্ত সেন কর্ণাটকে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং বৃদ্ধবয়সে রাঢ় দেশের (বর্দ্ধমান বিভাগের) গঙ্গাতীরে এসে বসবাস শুরু করেন। সামন্ত সেন কর্ণাটক ও প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করায় এই বংশ এমন সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী হয়েছিল যে, তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরা বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। বাংলায় এসে সামন্ত সেন কোন রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন

'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়েছিলেন এবং রাঢ়ের কিছুঅংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। পরবর্তী রাজা বিজয় সেনের কাহিনী ব্যারাকপুরের তাম্রশাসন ও দেওপাড়ার লিপি থেকে জানা যায়। বিভিন্ন লেখ ও লিপি থেকে তাঁদের কর্ণাটক থেকে বঙ্গদেশে আগমনের কথা জানা যায়। নৈহাটি তাম্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী সামন্ত সেনের পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই তাঁদের বংশধরেরা সুদূর রাঢ় দেশে এসে বসবাস শুরু করেন। সামন্ত সেন বানপ্রস্থের জন্য কর্ণাটক থেকে বঙ্গদেশের গঙ্গাতীরে এসেছিলেন এবং তার উত্তর পুরুষেরাও পাকাপাকিভাবে বঙ্গদেশে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন নি কিন্তু তিনি ছিলেন 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়দের শিরোভূষণ': একথা তৎকালীন লিপিতে বর্ণিত হয়েছে।

হেমন্ত সেন—সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজয় সেন (১০৯৫—১১৫৮ খৃঃ)—হেমন্ত সেনের পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন বাংলার রাজা হন। স্পষ্টতঃ জানা যায় যে তিনি (৬৩ বৎসর কাল) রাজত্ব করেন। এই কানাড়ী রাজবংশ বঙ্গদেশে কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাই লাভ করেননি, বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা তৎকালীন হিন্দুসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বিজয় সেনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাতে আমরা জানতে পারি যে তিনি একজন সুযোগ্য ও কৃতিত্ব সম্পন্ন নৃপতি ছিলেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিজয় সেনের যোগ্যতার সপক্ষে বলেন—বিজয় সেন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নেন এবং সফলতা অর্জন করেন। (fished in troubled water of Bengal Politics and came out successfully.) তিনি নান্যদেব, বীরদেব, রাঘববর্দ্ধন প্রভৃতি স্বাধীন ভূস্বামী এবং গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপের রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করেন। শোনা যায়, তিনি নান্যদেবের সাহায্যে গৌড় ও বঙ্গের ক্ষমতা হ্রাস করেন, পরে তিনি নান্যদেবের রাজ্যটির অধিকাংশই অধিকার করে নেন। বিজয় সেনের উত্তরবঙ্গ অধিকারের সময় পৌত্র লক্ষ্মণ সেন প্রবল পরাক্রমে সৈন্য পরিচালনা করে, তাঁকে সাহায্য করেন। বিজয় সেন সম্ভবতঃ গৌড়রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করেননি। তবে তাঁর পৌত্র লক্ষ্মণ সেন সেই সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি

ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। বিজয় সেন তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তার সাধন করেন।

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১২৫৮—১২৭৯ খৃ:) সিংহাসন লাভ করেন। সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে তাঁর মগধ ও মিথিলা জয়ের উল্লেখ আছে। তিনি শুধু নৃপতি ছিলেন না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও সমাজপতিও। তাঁর রাজত্বকালে তিনি গুণগত মানানুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের বেছে নিয়ে তাঁদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

কৌলিন্য প্রথা—

এই কুলীন নির্বাচনে তিনি নয়টি গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন— আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দানশীলতা:—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এরপর নির্দেশজারী করা হয় যে, এইরূপ কুলীন পাত্রপাত্রীর সঙ্গে অকুলীন পাত্র পাত্রীর বিবাহ দেওয়া সমীচিন নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কুলীন ও অকুলীনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। মনে হয় কুলীনের আচার, বিদ্যা, তীর্থদর্শন প্রভৃতি অর্জিত (acquired) গুণগুলিকে ও সহজাত (somatic) ভেবে নিয়ে সমাজপতিরা তা রক্ষার জন্য সমবর্ণের কুলীন ও অকুলীনের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। অকুলীন পাত্রকে কন্যাদান করলে সেই পরিবার "কৌলিন্য" হারাতেন বা কুলচ্যুত হতেন। এইজন্য ঐতিহাসিক কুলীনদের উত্তর পুরুষেরা উল্লিখিত কৌলিন্য গুণগুলি না থাকলেও কেবলমাত্র কুলীন পিতার পুত্র বা বংশধর হলেই নিজেকে কুলীন আখ্যায় ভূষিত করে বহুবিবাহে তথা বিবাহ ব্যবসায়ে লিপ্ত হতেন। এই ব্যবস্থার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাদের একাধিক সপত্নী থাকায় জীবনের অধিকাংশ কালই অশান্তিতে অথবা পিতৃগৃহে একাকিনী থেকে অতিবাহিত করতে হতো। তাছাড়া কুলীন সমাজের অনেক কিশোরী কন্যাকেই পিতার কুলরক্ষার জন্য অসমবয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হতো।

এদিকে আবার অকুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের যুবকেরা তাঁদের বিবাহযোগ্য কন্যা পেতেন না। কেন না কন্যার পিতারা কুলীন বরকে কন্যা দান করে কৌলিন্য

গৌড় ও তার পার্শ্ববর্তী চারি রাজ্য
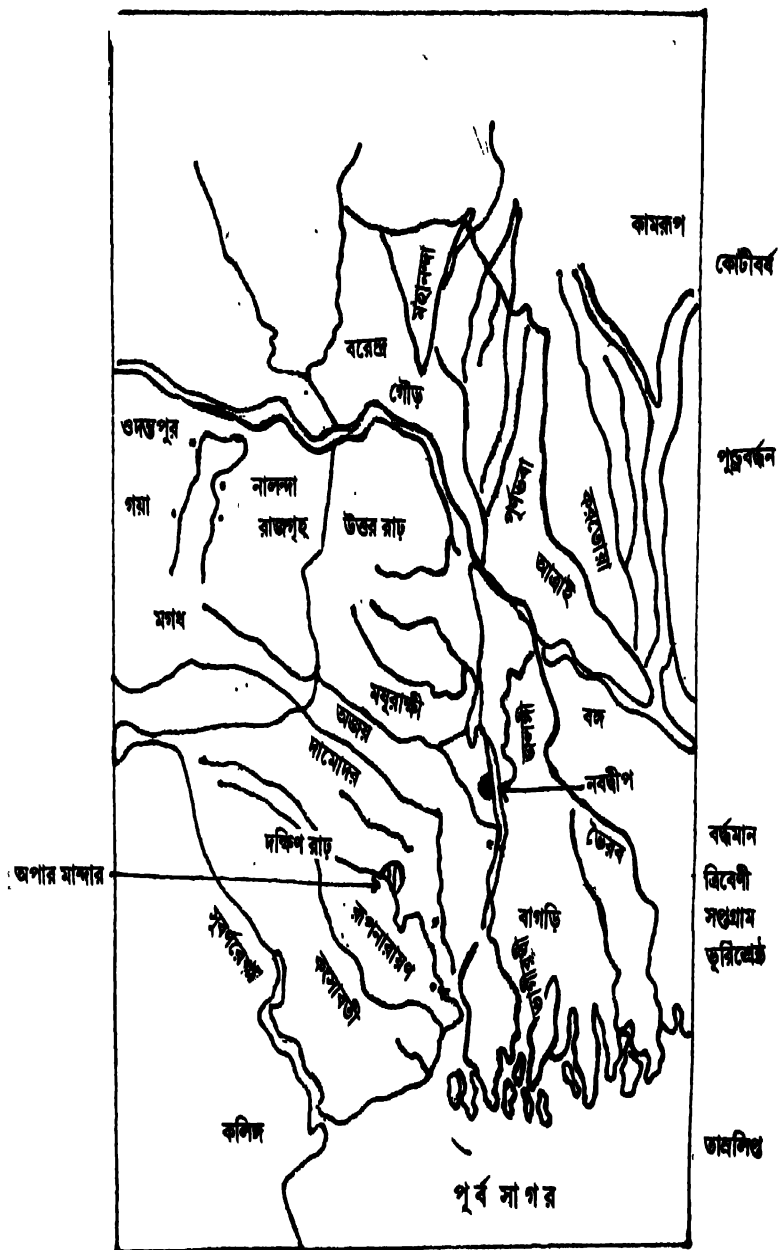
গৌরব অর্জনের চেষ্টা করতেন। অকুলীন ব্রাহ্মণ যুবকদের বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব পূরণ করার জন্য দূরদেশ থেকে নৌকা করে কন্যাদের আনা হতো। কৌলিন্য প্রথার জন্য এই উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং কায়স্থদের মধ্যে এইরূপ শ্রেণী বিভাগ বাঙালী সমাজের ঐক্য ও সাম্যকে নষ্ট করে ফেলেছিল এবং সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তন ছাড়া বল্লাল সেন বঙ্গদেশের বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করে তাঁদের বিরাগ ভাজন হন এবং ফলে সেনবংশীয় রাজারা তাঁদের সমর্থন হারান। পরিশিষ্টে 'বর্ণাশ্রমধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বঙ্গের বণিক সমাজ

নদীমাতৃক বঙ্গদেশ ছিল বণিক, শ্রেষ্ঠী সার্থবাহের দেশ। য়ুয়ানচোয়াং গঙ্গার মুখে গঙ্গা বন্দরের কথা, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করে গেছেন।

সোমদেবের "কথা সরিৎ সাগরের" কথাতে পাই, তাম্রলিপ্তি বিভবশালী বণিকদের কেন্দ্র ছিল। তাঁরা লঙ্কা, সুবর্ণদ্বীপ ও অন্যান্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন।

মালয়ের কেদ্দায় গুনুংজরাইয়ের বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া বঙ্গদেশের রাঙামাটির মহানাবিক বুধ গুপ্তের যাত্রাসিদ্ধি কামনায় শ্লেট পাথরের উৎকীর্ণ লিপি (৪র্থ-৫ম শতক) ও রাজা বালপুত্রদেবের নালন্দা লিপি (দশম শতক) ইত্যাদি হল পূর্ব ভারতের বণিকদের সঙ্গে ভারত মহাসাগরে যবদ্বীপ, সুবর্ণ-দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপগুলির পণ্য ও সংস্কৃতি বিনিময়ের পাথুরে প্রমাণ। বর্তমান লেখকের পাতালদেশের পুরাবৃত্ত ও The Indians and the Amerindians প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলার বণিকেরা যে প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এমনকি লাতিন আমেরিকাতেও তাঁদের কার্পাস বস্ত্র (পটি) ইত্যাদি পণ্য এবং বৌদ্ধ ধর্মাচার ও দেবদেবী দ্রব্য, কথ্য ভাষাও নিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আলোচিত হয়েছে। বঙ্গদেশে সেন আমলে মুদ্রার পরিবর্তে যে কড়ির প্রচলন ছিল তাও আসত দূর সমুদ্র থেকে। মিনহাজউদ্দিন লিখে গেছেন লক্ষ্মণ সেনের নিম্নতম দান ছিল 'এক লক্ষ কড়ি'। এই কড়ি যে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ তা ভারতের উপকূলের বঙ্গোপসাগরে বা আরবসাগরে পাওয়া যায় না। কড়ি সংগ্রহ করতেন বণিকেরা আরও দূরে সমুদ্র—ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকে।

এইসব ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বণিকশ্রেণী প্রচুর অর্থসম্পদ ও বিভিন্ন দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে সমাজে প্রভাব বিস্তার

করেছিলেন। বুধ গুপ্তের মতো বাংলার যুবকেরা সে যুগে 'রাজসেবা' বা চাকরির জন্য লালায়িত ছিলেন না। স্বাধীন ব্যবসাবাণিজ্যই ছিল সে যুগের যুবকদের সবচেয়ে বেশী পছন্দ। অর্থাৎ সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক ইত্যাদি বৃত্তিই ছিল উৎকৃষ্ট বৃত্তি। তারপরে স্থান ছিল কৃষিকর্মের, মৎস্য উৎপাদন ও পশুপালনের। স্বর্ণকার, কর্মকার, কংসকার, প্রভৃতি উচ্চস্তরের বৃত্তির মধ্যে গণ্য ছিল—শঙ্খকার, তন্তুবায়, মালাকার প্রভৃতির পরে সর্বশেষে স্থান ছিল রাজসেবার। এই যুগের রচিত একটি শ্লোক থেকে সেকালের বঙ্গের যুবক সমাজের বৃত্তি নির্ণয়ে পছন্দ অপছন্দের কথা জানা যায়।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী
তদর্দ্ধং কৃষি কর্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াম্
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যে বহির্বাণিজ্য থেকেই এসেছিল এ তথ্যটি বাঙালীর মূর্ত্তি কলাতেও স্থান পেয়েছে।

'গজলক্ষ্মী' এসেছিলেন সমুদ্র থেকেই—দেবতা ও অসুর বা পনিদের সমুদ্র মন্থনের ফলে। 'পনি' কথাটি থেকে "পণ্য" ও বণিক প্রভৃতি শব্দগুলি এসেছে। (পনি র্বণিক ভবতি) মধ্যযুগের বাংলা লোককথায়—কাব্যে যে 'হীরামাণিক', ধনপতি 'সদাগর' প্রভৃতির নাম পাই তাঁরা শুধু নামেই নন, বস্তুতঃ হীরামাণিকও অজস্র ধনধান্যের অধিকারী ছিলেন। গঙ্গাতীরের 'ভুরশুট' ইত্যাদি গ্রামের নাম ও প্রাচীন বঙ্গের শ্রেষ্ঠীদের বিত্তবত্তার পরিচয় বহন করে চলেছে। 'ভুরিশুটে'র প্রাচীন নাম ভূরিশ্রেষ্টিক—ভূরিস্থষ্টি। ভূরিশ্রেষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায় ভট্টভবদেবের শিলালিপিতে। শ্রীধর আচার্যের ন্যায়কদলী গ্রন্থেও স্পষ্টই বলা হয়েছে 'ভূরিস্থষ্টি রিতি নাম ভূরিস্থষ্টি জনাশ্রয়'। সেন রাজা বল্লাল সেনের সময় এমনি একজন ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ধনী বণিক ছিলেন বল্লভানন্দ। বল্লাল সেনের শিক্ষক গোপাল-ভট্টের 'বল্লালচরিত' গ্রন্থে বল্লালসেন ও বল্লভানন্দের মধ্যে অসম্প্রীতির কাহিনীটি পাওয়া যায়। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বল্লালসেন বল্লভানন্দের কাছ থেকে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। বার বার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সে অর্থ নিঃশেষিত হয় কিন্তু বল্লাল সেন একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য প্রস্তুত হন এবং বল্লভানন্দের কাছ থেকে আরও দেড় কোটি সুবর্ণ মুদ্রা (নিষ্ক) চেয়ে পাঠান। বল্লভানন্দ এই সুবর্ণ মুদ্রা দিতে রাজী হন কিন্তু তার

পরিবর্তে হরিকেলের রাজস্ব দাবি করেন। বল্লালসেন তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লভানন্দ ও বেশ কয়েকজন বণিকের ধনরত্ন জোর করে কেড়ে নেন এবং নানাভাবে তাদের হেনস্থা করতে শুরু করেন। রাজ প্রাসাদে বণিকদের আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করে তাঁদের শূদ্রদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাবার ব্যবস্থা করা হয়। এতে বণিকেরা অপমানিত বোধ করেন এবং আহার গ্রহণে আপত্তি জানান। বল্লালসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী মগধের রাজা ছিলেন বল্লভানন্দের জামাই। তার উপর বল্লাল সেন শুনতে পান যে, বণিকদের নেতা বল্লভানন্দ পালরাজাদের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। ক্রুদ্ধ বল্লালসেন বণিকদের এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবার জন্য তাঁদের শূদ্র স্তরে নামিয়েছিলেন। তাঁদের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলে, তাঁদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করলে, কিংবা তাঁদের শিক্ষাদান করলে ব্রাহ্মণরা পতিত হবেন— এমন বিধান দিয়েছিলেন। বণিকেরা প্রতিশোধ নেবার জন্য সমস্ত জলচলশ্রেণীর দাসভৃত্যদের দ্বিগুণ তিনগুণ মূল্য দিয়ে নিজেদের কাজে নিযুক্ত করে ফেললেন। উচ্চবর্ণের লোকেরা তখন দাসের অভাবে বিপদে পড়ে গেলেন। এই সংকট নিবারণের জন্য বল্লালসেন তখন বাধ্য হয়ে কৈবর্ত সমাজকে 'জলচল' বর্ণে উন্নীত করে দিলেন। এমনকি তাঁদের নেতা মহেশ 'মহামাণ্ডলিক' পদে উন্নীত হল। মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতি সম্প্রদায়ও সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত হলেন। সুবর্ণ বণিকদের উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অনেক বণিক বঙ্গদেশ ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেলেন। বল্লালসেনের এই অসহিষ্ণুতা বণিক বিদ্বেষের ফলে বঙ্গদেশের ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর অর্থব্যবস্থার ক্ষতি হল। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং সেনরাজবংশ বণিকদের সর্বময় প্রীতি ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হল। এইসব কারণে পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কি আক্রমণের সময় তাদের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশের প্রজাসাধারণের মধ্যে সংহতি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারেনি।

লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৫ খৃঃ)

বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'গৌড়েশ্বর' ছাড়া তিনি 'অরিরাজ মর্দন' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে পরম বৈষ্ণব বলেও ঘোষণা করেন। বিভিন্ন লেখ ও লিপি থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, কাশী, পুরী, বারানসী ও এলাহাবাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, লক্ষ্মণসেন এইসব রাজ্য তাঁর পিতামহ বিজয়সেনের রাজত্বকালেই সেনাপতি রূপে দখল করেছিলেন।

গয়া জেলায় প্রাপ্ত 'লেখ' থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেন গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রকে মগধ থেকে বিতাড়িত করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া গাহড়বালের অধিকারে ছিল তার লিপিপ্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মগধ অধিকার এবং প্রয়াগ পর্যন্ত অভিযান গাহড়বাল রাজশক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই রাজ্যই ছিল সেন-রাজ্যের ও অগ্রসরমান তুর্কিদের মধ্যে প্রতিরোধ প্রাচীর বা buffer রাজ্য। এই প্রাচীর ধ্বংস করে লক্ষ্মণসেন দূরদৃষ্টির পরিচয় দেননি।

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার ঃ

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে দেখা যায় মুসলিম ভাগ্যান্বেষীরা সেনরাজাদের হঠিয়ে দিয়ে পূর্বভারতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে বাংলা থেকে দিল্লীর দূরত্বের সুযোগ নিয়ে বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বিন বখতিয়ার খলজি। অন্যেরা চেয়েছিলেন বাংলাকে দিল্লীর সুলতানির অধীনে আনতে। বখতিয়ারের বঙ্গ অভিযানের সময়, লক্ষ্মণসেন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। বার্ধক্যে প্রতাপশালী লক্ষ্মণসেনের মতোই রাজশক্তির প্রতাপ ও শক্তি খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল সে সময়। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজার প্রতাপ স্তিমিত হলেও বিহার থেকে গুপ্তচরদের অগোচরে বখতিয়ার আকস্মিক আক্রমণে কিভাবে বাংলা জয় করলেন? বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়ত আকস্মিক, কিন্তু তার আঘাতে একটি রাজ্য ও রাজত্বের অবসানের কারণ এই একটি নয়, কতগুলি অন্তর্নিহিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও অবক্ষয় সেনরাজত্বের পতনের পটভূমি সম্পূর্ণ করে রেখেছিল, তুর্কি আক্রমণ তাকে ত্বরান্বিত করেছে। অবশ্য এর সঙ্গে তুর্কি রণনীতি ও কৌশলের কথাও বিবেচ্য। ভারতীয় রণকৌশলের পাশাপাশি অতর্কিত সুশৃঙ্খল আক্রমণ এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নিয়ম-নীতি ও অপরিচিত সংস্কৃতির অভিঘাতও একধরণের নৈতিক বিমূঢ়তা এনেছিল, ফলে বঙ্গে সেন রাজত্বের অবসান ঘনিয়ে আসে।

রামশরণ শর্মার মতো কয়েকজন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক বলেন, প্রায় সপ্তম শতাব্দী থেকেই ক্রমিক বাণিজ্যিক অবক্ষয়ে বাংলার শাসনব্যবস্থা রাজাদের অন্তর্কলহে দুর্বল হতে থাকে। অধ্যাপক শর্মা অবশ্য সপ্তম ও অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি কালপর্বকে ভারতে সামন্ততন্ত্রের যুগ বলেছেন এবং সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও নগরজীবনের অবক্ষয় দেখিয়েছেন। বাংলার অবক্ষয়কেও তার সঙ্গে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করেছেন। আরবীয়রা শুধু মাত্র সাম্রাজ্যলোভীই ছিলেন না,

তাঁরা ছিলেন ব্যবসায়ীও। তাঁরা নদীপথ দখল করে ব্যবসা-বাণিজ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। লালনজি গোপালের মতে—ভারতবর্ষে তৎকালীন বহু বন্দরে চলমান ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমান আক্রমণের পরে ধ্বংস হতে থাকে এবং এক অবক্ষয় পর্ব দেখা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মহম্মদ ঘোরির দিল্লী আক্রমণও কুতুব উদ্দিন আইবকের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বখতিয়ারের বারংবার আক্রমণের ফলে মুসলিম আধিপত্য ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। বাংলায় তখন হিন্দু সেন রাজারা রাজত্ব করতেন, তারও আগে রাজত্ব করেছেন বৌদ্ধ পাল রাজারা। এই সময় পাল-রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার (ত্রি-শক্তি দ্বন্দ্ব) সংগ্রাম দেখা যায়। গুপ্তযুগে এ ধরণের দ্বন্দ্ব ছিল না, সে সময় ছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এরপর যে বংশই রাজ্যজয় করেছে তারাই সাম্রাজ্য গড়ার প্রয়াস পেয়েছে। সেন যুগে বাংলা আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতিতে সেন রাজারা শুধু যে সাম্রাজ্যস্থাপন করেছিলেন তা নয়, পাল যুগের বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করে তাঁরা চতুরাশ্রম ধর্মের ও চতুর্বর্ণের প্রবর্তনের চেষ্টাও করেছিলেন। মগধের উত্থানের সময় বাংলার ব্রাহ্মণদের বলা হত 'ব্রহ্মবন্ধু'। দ্বাদশ শতাব্দীতে কল্হন তাঁর রাজতরঙ্গিণী-তে বলেছেন 'বাঙালিরা মাছ খেত, ফূর্তি করত—এরা ছিল নম্রস্বভাব' সেনদের সময়ে দেবদেবীর মূর্তিপুজোরও চল ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত'-এ বলেছেন—বাঙালী সমাজে একধরণের নাগরিক সভ্যতা, বিলাসিতা ছিল, প্রচলিত ছিল নটনটী, দেবদাসী প্রথাও—এভাবে সমাজমানসে একধরণের শৈথিল্য এসেছিল। দেখা দিয়েছিল অলৌকিক সিদ্ধিকামী কিছু তান্ত্রিক অবিচার, যার প্রমাণ পাওয়া যায় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মন্দিরগাত্রে—স্থাপত্যে ও পোড়ামাটির ফলকসমূহে। এই সময় দরবারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে নাগরিক সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছিল জয়দেব, ধোয়ী প্রমুখের হাতে। কিন্তু সেই উচ্চমানের কাব্যগীতি চর্চা এবং নান্দনিক পরিবেশ, প্রচণ্ড শক্তিশালী ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর তুর্কি বিজয়কে ঠেকাবার মত মানসিক পরিমণ্ডল ও প্রতিরোধশক্তি রচনা করতে পারেনি। তাই মুসলিম সংস্কৃতি যদিও বাংলায় অনুপ্রবেশ করে এই সংস্কৃতি কামরূপে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি বক্তিয়ার খলজির শাসনকালে।

ভারতে তুর্কিদের অগ্রগতির প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয় ১২০২-১২০৩ সালে। এই সময় বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে এসে প্রথমে নবদ্বীপ এবং পরে লক্ষ্মণাবতী জয়

করেন। বাংলাদেশে সুলতানি শাসনের প্রবর্তন এই ভাবেই ঘটে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান যখন তুর্কিদের করতলগত, তখন অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও বিহার অঞ্চলে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় সেনরাষ্ট্র ও সমাজ তখন ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে সক্রিয় সামন্ততন্ত্র, অন্যদিকে স্ফীত আমলাতন্ত্র বাংলার সামাজিক জীবনেও বিচ্ছিন্নতাবাদের উন্মেষ ঘটায়।

বখতিয়ার খলজির আদিনিবাস :

দশম শতাব্দীর লেখক ইশতাকৃদি বলেছেন যে, 'খলজিদের নিবাস ছিল ঘোর অঞ্চলের কাছাকাছি এবং তুর্কি ধাঁচের চেহারা, পোষাক-চালচলন ও ভাষা। পেশায় তাঁরা গোচারক ছিলেন। এ থেকে এবং পরবর্তীকালের কিছু লেখকের মন্তব্য থেকে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে এই মতই বহুসম্মত যে, খালাজ বা খলজিরা ছিলেন তুর্কি। একাদশ শতক নাগাদ তাঁদের কথা পাওয়া যায় খালাজ, তুর্কি বা যাযাবর হিসাবে। অথচ ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বলে তাদের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সেই রাজ্যের সীমানাগুলির সঙ্গে, যাতে তাঁরা তখন বাস করছিলেন।

বাংলার আইয়াজ খলজির (১২১১-২৭) মিনহাজ রচিত জীবনীসূত্রের শুরুর দিকের এক চিত্তাকর্ষক অনুচ্ছেদ থেকে এটা খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, খলজিরা সামরিক বা যোদ্ধার জাত নন, বরং সাধারণ দেহাতি মানুষ। বলা হয়েছে যে যখন আইয়াজ ভারবাহী গাধা নিয়ে গ্রামে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে কিছু দরবেশের দেখা হয়। তাঁদের মধ্যে কথোপকথনে এটা পরিষ্কার যে, তিনি ছিলেন ঘোর অঞ্চলের গরমসের জেলার লোক। এইভাবে বখতিয়ার খলজিকেও ঘোরের খলজি এবং একই জেলা থেকে আগত বলা হয়েছে। গরমসের জেলা ছিল সম্ভবত অধুনা ওরজগান উপত্যকা, যা একসঙ্গে ঘোর, জমিনদাবাদ এবং গজনির সীমান্তবর্তী ছিল। এ থেকে অনুমিত হয় প্রথমে বখতিয়ার ও তার পরে আইয়াজ খলজি এবং অন্যান্য মুসলিম ভাগ্যান্বেষী— যাঁরা বাংলায় সুলতানি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে ছিলেন—অনেকেই ঘোরের এই অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

বখতিয়ার খলজি ঘোর অঞ্চলের গরমসেরস্থিত তাঁর বাসভূমি থেকে গজনিতে সেনাদলে সৈনিক হিসাবে নাম লেখাতে এসেছিলেন। সেখানে পরিদর্শক (দর দিওয়ান-ই-আরজ) তাঁকে খারিজ করলে বখতিয়ার দিল্লি এলেন এবং আবার সেখানেও একই ভাবে বাতিল হলেন। এরপর তিনি বদায়ুনের মুক্তির কাছে

আসেন এই মুক্তিই তাঁকে সামরিক কাজ দিয়ে বেতন ধার্য করে দেন। সেখান থেকে বখতিয়ার নতুন পাওয়া অস্ত্র এবং ভাল ঘোড়া নিয়ে অযোধ্যায় যান। শেষ পর্যন্ত ভাল কাজ করার পর তাঁকে ঠিক ইক্তা* না হলেও দু'টি জায়গা দেওয়া হয়। তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্যের সংবাদ হিন্দুস্তানের সব খলজিদের মধ্যে ছড়ায় এবং তাঁরাও এসে বখতিয়ারের সঙ্গে যোগ দেন।

বখতিয়ার খলজির অভিযান :

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি বিহারে এসে ওদন্তপুর মহাবিহার ধ্বংস করেন। সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেন ও বৌদ্ধ ত্রিপিটক অন্যান্য চর্যা এবং দর্শনের যে সব রাশি রাশি পুঁথি সেই মহাবিহারে রক্ষিত ছিল তা জ্বালিয়ে দিয়ে দিল্লী চলে যান। এক বছর পরে, ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তিনি বিহারে এসে তুর্কি অধিকার কায়েম করার চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে তুর্কিদের বিহার আক্রমণ, ধর্মবিদ্বেষ ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের সংবাদ নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁর সভাসদদের কাছে পৌছায়। শোনা যায়—রাজজ্যোতিষীরা গণনা করে রাজাকে জানান যে, বখতিয়ার খলজির সঙ্গে যুদ্ধ হলে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা তো নেইই, পরন্তু এই যুদ্ধে তাঁর প্রাণহানিরও আশঙ্কা আছে। বঙ্গদেশ শেষ পর্যন্ত ম্লেচ্ছদের করায়ত্ত হবে। বরনির মতে, এক জ্যোতিষী বলেছিলেন, বিজেতারূপে একজন ব্যক্তি আসবেন। তাঁর হাত হবে আজানুলম্বিত এবং তিনি হবেন বামন—একথা নাকি জ্যোতিষীদের গণনা ও শাস্ত্রের অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী। আর তাঁরা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, তুর্কি আক্রমনকারীটির চেহারার সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত পরাভবকারীর চেহারার সম্পূর্ণ মিল আছে। এসব শুনে রাজপরিবারের অনেকেই রাজাকে সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে নবদ্বীপ ত্যাগ করে তাঁর মূল রাজধানী বিক্রমপুরে প্রস্থানের পরামর্শ দেন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বণিক নবদ্বীপ ছেড়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামে চলে যান। অতীতের বহুযুদ্ধ জয়ী সাহসী ও বীর, অশীতিপর লক্ষ্মণসেন কিন্তু এইসব পরামর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি নবদ্বীপেই থেকে গেলেন। এদিকে ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি একটি সৈন্যদল গঠন করে বিহার শরিফ থেকে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের জনপদের ভিতর দিয়ে নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন। তাঁর অধিকাংশ সৈন্য পিছনে ছিল, তিনি মাত্র ১৮ জন সৈন্যসহ

---

* সুলতানকে প্রয়োজনীয় সৈন্য সাহায্য দেবার চুক্তিতে যে নিষ্কর জমি কোন আমীর ওমরাহ পেতেন তাঁকে বলা হত 'ইকতা'।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ধীর গতিতে রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হন। পথের জনতা তাঁকে একজন অশ্ববিক্রেতা মনে করে কোনও বাধা দেয়নি। এরপর তিনি সম্পূর্ণ অতর্কিতেই রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন প্রাতঃ-কালীন রাজকার্য সমাপ্ত করে অন্দরমহলে এসে মধ্যাহ্নভোজনে বসেছিলেন। রাজপ্রাসাদে পৌঁছেই বখতিয়ার গণহত্যা শুরু করেন। ভোজনরত রাজা প্রবল আর্তনাদ শুনতে পান ও কোনও উপায়ান্তর না দেখে তিনি নগ্নপদেই অন্দরদ্বার দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং তুর্কিদের এড়িয়ে অবশেষে তিনি পূর্ববঙ্গের মূল রাজধানী বিক্রমপুরে (জয়স্কন্ধাবারে) পৌঁছান। বখতিয়ার খলজির নবদ্বীপ আক্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন দিল্লীর ভূতপূর্ব প্রধান কাজী মৌলানা মিন্‌হাজউদ্দিন। তিনি এই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে লক্ষ্মণাবতীতে এসে দুই বছর কাটিয়েছিলেন। সেইসময় দুই বৃদ্ধ সৈনিক—নিজামউদ্দিন ও সামস্‌উদ্দিন যাঁরা বখতিয়ারের বাহিনীতে ছিলেন—তাঁদের মুখ থেকে বখতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের কাহিনী শুনে তা লিপিবদ্ধ করেন।

মিনহাজের বিবরণ লেখার একশতকের মধ্যে ঐতিহাসিক ইসমিও তাঁর 'ফুতুহ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের আরও একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই দুটি বিবরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা খুব সামান্য। ইসমির বিবরণ অনুযায়ীও বখতিয়ার অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশেই নদীয়ায় প্রবেশ করেন। আর নগরদ্বারে এসেই তিনি রাজাকে সংবাদ পাঠান বাইরে এসে তাঁদের আনা তাতার অশ্ব, চিনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী পরীক্ষা করার জন্য। এরপর রাজা ঘোড়া বাঁধার জায়গায় এসে উপস্থিত হন। বখতিয়ার রাজাকে খুব মূল্যবান একটি উপঢৌকন দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের ইঙ্গিত দেন হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। হিন্দুরা এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে পরাস্ত হন। একদল সৈন্য কিন্তু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকে। তুর্কি সৈন্যদের মনে তখন ত্রাসের সঞ্চার হয়। এরপর মূল সৈন্যদল থেকে তুর্কি অশ্বারোহী সৈন্যরা ঝড়ের বেগে এসে কিছু সংখ্যক হিন্দু সওয়ারকে বন্দী করলে রাজা লক্ষ্মণসেন বখতিয়ারের হাতে বন্দী হন। এই দুটি স্বতন্ত্র বিবৃতি থেকে একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে, আক্রমণ ঘটে বেলা দ্বিপ্রহরে যখন রাজকর্মচারি ও সভা-সদরা প্রায় সকলেই ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

নবদ্বীপ সেনরাজাদের রাজধানী ছিল না এটি ছিল গঙ্গা তীরবর্তী একটি

তুর্কী আক্রমনের সময়ের উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির অবস্থিতি ও সীমানা।
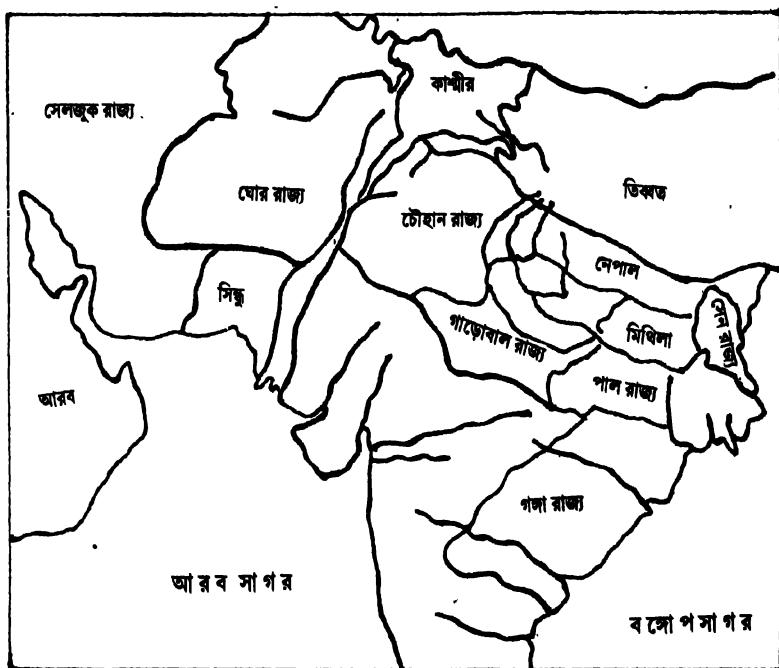
তীর্থস্থান। সেখানে গঙ্গার কোল ঘেঁষে সেন রাজারা তাঁদের একটি তীর্থ নিবাস নির্মাণ করেছিলেন। এখানে তাঁদের কোনও পাথরের দুর্গ ছিল না। সেন রাজাদের প্রকৃত রাজধানী ছিল বিক্রমপুর বা জয়স্কন্ধাবার। সেন রাজকুলের প্রথম দিকে সমস্ত লিপি লিখিত হয়েছিল 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে'। লক্ষ্মণসেনের পূর্বপুরুষ সামন্তসেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীরে বাসের জন্য রাঢ় দেশে এসেছিলেন। সেনবংশের রাজারা ধর্মপরায়ণ ও শাস্ত্রবিদ হওয়ায় সামন্তসেনের উত্তর পুরুষেরা গঙ্গাতীরে তীর্থনগরী নবদ্বীপে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করতেন।

নদীয়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে বিক্রমপুরে গিয়ে লক্ষ্মণসেন আরও পাঁচ বছর সেখানে রাজত্ব করেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সম্ভবত তুর্কিদের সঙ্গে আবার তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল। তাঁর সভাকবি শরণ লক্ষ্মণসেনের হাতে একবার এক ম্লেচ্ছ রাজের পরাজয়ের কথাও লিখেছেন। মিনহাজ বা ইসমি কিন্তু এ বিষয়ে নীরব।

ভ্রূক্ষেপাদ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি বিজয়তে কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান
চেতশ্চেদিক্ষিতীন্দোস্তপতি বিতপতে সূর্যবদ দুর্জনেষু।
স্বেচ্ছাম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানং
কাশীভর্তু প্রকাশং হরতি বিহরতে মূর্ধ্নি যে মাগধস্য ॥

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যুদ্ধরীতি বিরুদ্ধ আক্রমণ বা অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণসেনকে পশ্চাদপসরণ করতে হলেও পরবর্তী কোনও কোনোও সম্মুখ সমরে সম্ভবত লক্ষ্মণসেন তুর্কিদের পরাস্ত করেছিলেন। নবদ্বীপ অঞ্চলে তুর্কিরা তাদের শাসনভার কায়েম করার পঞ্চাশ বছর পরেও দেখা যায় সেনরাজারা বিক্রমপুরে রাজত্ব করে গেছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন লক্ষ্মণসেনের আত্মমর্যাদা, মহত্ব ও দানশীলতার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। 'রায়লখমনিয়া' মহৎ রাজা ছিলেন এবং হিন্দুস্তানে তাঁর মত সম্মানিত রাজা আর কেউ ছিলেন না। তাঁর হাতে কারও উপর অন্যায় অত্যাচার হয়নি। একলক্ষ কড়ির কমে তিনি কাহাকেও কিছু দান করতেন না।

লক্ষ্মণসেনের সার্বভৌমত্বে স্বেচ্ছাচ্চারিতা ছিল না।

লক্ষ্মণসেন ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ রাজা ছিলেন। তাঁর সার্বভৌমত্ব কিন্তু মন্ত্রী, উপদেষ্টা, সভাসদগণের পরামর্শ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করেনি। 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থে তাঁর রাজসভার একটি ঘটনা* থেকে একথা প্রমাণিত হয়। মহারাজের এক

* পরিশিষ্টে ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শ্যালক (কুমার দত্ত) কামপরবশ হয়ে এক বণিক বধূর (মাধবীর) প্রতি অসদাচরণ করেন। তার প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন মাধবী। লক্ষ্মণসেন তাঁর উপদেষ্টা গোবর্ধনাচার্যের প্রতিবাদে সুবিচার করে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিলেন শ্যালককে। সে দিন থেকে দীর্ঘ আটশ' বছর অতিক্রান্ত হবার পর—বর্তমানে দেশে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন (rule of law) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে রাজশক্তির ধারক ও বাহকদের কোন শ্যালক বা সম্বন্ধীয় ব্যক্তির অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উপদেষ্টা গোবর্ধনাচার্যের মতো উদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারবেন কয়জন সরকারী উপদেষ্টা ? যদি কেউ এই হঠকারিতা করেন তবে সেই উপদেষ্টাকেই হয়তো বদলী করা হবে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে—তিনি শিকার হতে পারেন দৈহিক নির্যাতনের ও আর্থিক বঞ্চনার। অথবা আন্দামানে শারীরিক নির্যাতন বা অর্থকষ্ট দিয়ে প্রশাসন তাঁর তেজস্বী বিবেকবোধকে দমনের চেষ্টা করবে। বর্তমান গোবর্ধনাচার্যকে তাঁর সাধের 'আর্যা সপ্তশতী' অপ্রকাশিত রেখেই বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। এইভাবে ঋষি ঋণ অপরিশোধিত রেখেই একজন গোবর্ধনাচার্য এযুগ ও এদেশ থেকে বিদায় নিলেও আবার নতুন নতুন আচার্য জন্মাবেন—তাঁর চিতাভস্ম থেকে—যিনি শিক্ষা নেবেন পূর্বসূরী গোবর্ধনের জীবনী থেকে, দীক্ষা নেবেন তাঁর 'অভী' মন্ত্রে—সাধনা করবেন ধর্মকে গ্লানি মুক্ত রাখতে ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে রোধ করতে। এদেশীয় আচার্যদের এই ধারা অন্তঃসলিলা হলেও লুপ্ত হয়ে যায়নি। রাষ্ট্র ও ধর্মের সঙ্কটে আজও গোবর্ধনা-চার্যেরা তাই সোচ্চার না হয়ে পারেননা। এঁরা 'আচার্য', এঁদের 'চর্চা'র সঙ্গে 'চর্যা' অভিন্নভাবে যুক্ত। তাই ন্যায় ও ধর্মের সংরক্ষণের জন্য এঁরা দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দিন থেকেই বলি প্রদত্ত।

লক্ষ্মণসেন যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা আজও সব রাষ্ট্র সেবকদের মূল্যবোধের আদর্শ স্বরূপ রয়ে গেছে। তাই ভারতবর্ষের স্পষ্টবক্তা গোবর্দ্ধন ও শেষনেরা আজও শেষ হয়ে যান নি, ধর্ম সংকটের সময় অনেক মন্ত্রকে, ধর্মাধিকরণে ও বিধানসভায় এঁরা প্রদীপ্ত হয়ে—প্রদীপের মত নিজেরা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে ধর্মকে গ্লানি মুক্ত রাখার চেষ্টা করে চলেছেন।

সার্বভৌম রাজা হওয়া সত্ত্বেও আচার্য, মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের পরামর্শকে উপেক্ষা করে সেকালের লক্ষ্মণসেনের মতো শক্তিমান রাজারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেননি সেজন্য রাজার নিজের বিবেকবুদ্ধি ও মহত্ব, আত্ম সংযম এবং সহন শীলতা ও সমানভাবে প্রশংসনীয় কেননা—'প্রসরতি মনি বিম্বোদগ্রাহে ন মৃদাং চয়ঃ'

মণি শুধু মধ্যাহ্নের সূর্যের রশ্মিকে প্রতিফলিত করতে পারে, বিচ্ছুরিত করতে পারে, কিন্তু মাটির ঢেলাতে সূর্যের রশ্মির প্রতিফলন বা বিচ্ছুরণ সম্ভব হয় না। লক্ষ্মণসেন নিতান্ত মাটির ঢেলা ছিলেন না। তাঁর রাজসভার পঞ্চরত্নের জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন, উমাপতি ধরের কবিতার যেমন তিনি রসগ্রাহক ছিলেন তেমনি সমকালীন স্মার্ত, পুরোহিত, ভিষক, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী ও জ্যোতিষীদেরও তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী, যোদ্ধা ও উৎসাহ বর্দ্ধক রাজা। কিন্তু তবুও ইতিহাস চক্রের অমোঘ আবর্তনে বঙ্গদেশ থেকে সেন রাজ্যের যবনিকা পতন শুরু হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালেই। বাংলার প্রজা সাধারণের তিনি ছিলেন প্রিয় রাজা, রাজসভার তিনি ছিলেন অলঙ্কার নবদ্বীপে সজ্জনের প্রতিপালক। কেন্দুবিল্ব থেকে জয়দেব যখন লক্ষ্মণসেনের সভায় এসেছিলেন তখন যে প্রশস্তিটি গেয়ে তিনি রাজবন্দনা করেছিলেন তাতে তিনি লক্ষ্মণ সেনকে 'বঙ্গ প্রিয়' 'সভালঙ্কার', 'পালকঃ সতাম্' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছিলেন। কবি জয়দেব বাংলার প্রজা সাধারণের মনের কথাই প্রতিফলিত করেছিলেন তাঁর এই প্রশস্তিতে—

> 'লক্ষ্মীকেলি ভুজঙ্গ'! জঙ্গমহরে! সংকল্পকল্পদ্রুম!
> শ্রেয়ঃ সাধকসঙ্গ! সঙ্গর কলা গাঙ্গেয়। বঙ্গপ্রিয়।
> গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজরাজক! সভালঙ্কার! কারার্পিত—
> প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালকসতাং! দৃষ্টোঽসিতুষ্টাবয়ম্!!

নবদ্বীপে মধ্যাহ্ন ভোজনরত লক্ষ্মণসেনকে অতর্কিত আক্রমণ করে সাফল্য লাভ করে বখতিয়ার খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। তিমি দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিব্বত জয়ে অগ্রসর হন। কামরূপ অতিক্রম করে হিমালয়ের পথে একটু অগ্রসর হতেই বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। পাহাড়ে অতর্কিতে ধ্বস নেমে আসে। সামনে ঘোড়ার চলার পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় পেছনে ফিরতে বাধ্য হন। কিন্তু ফেরার সময় দেখেন কামরূপের নদীতে হঠাৎ বন্যা নেমেছে। নদীর উপরে পাথরের যে সেতু ছিল, তার পাথর গুলি কামরূপী সৈন্যরা সরিয়ে দিয়ে সেতুটি নষ্ট করে দিয়েছে—এই ভাবে প্রকৃতির অতর্কিত আক্রমণে খাদ্যাভাবে ও শত্রুর হাতে বক্তিয়ারের তুরস্ক সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বখতিয়ারের এই বিপর্যয়ের কাহিনী ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে গৌহাটির কানাইবরশী বোয়ার একটি পাষাণ গাত্রে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। "শাকে তুরগযুগ্মেসে মধুমাস ত্রয়োদশে কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মায়য়ুঃ," অর্থাৎ কামরূপে এসে

আনুমানিক ১১২৭ শকাব্দের ১৩ই চৈত্র (অর্থাৎ ১২০৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ) তুরস্ক সৈন্যরা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণ ও অন্যায় যুদ্ধে অভিভূত করে বখতিয়ার যেমন লক্ষ্মণসেনের মতো বীর ও ধর্মপরায়ণ রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ না দিয়েই—তেমনি বখতিয়ার হিমালয়ের পর কিছুদূর অগ্রসর হতেই অজস্র বর্ষণ ও পার্বত্য ধ্বস অতর্কিতে নেমে এসে তাঁর সৈন্যদলকে অভিভূত করেছিল; নদীতে প্লাবনে সেতু নষ্ট হওয়ায় রসদ ও সৈন্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—এইভাবে তাঁর বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল—কোনও যুদ্ধের বা আত্মরক্ষার সুযোগ তাঁরা পাননি। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এই ঘটনার মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু এই সব ঘটনা সাধারণতঃই মানুষের মনে প্রকৃতির সুবিচার (Natural justice) এর একটা অস্পষ্ট ধারণা এনে দিতে পারে। শত্রুর মধ্যে নীতি বা মহত্ব থাকলে হয়তো অসমীয়া সৈন্যেরাও মানবিকতার খাতিরে নদীর সেতু পুনঃস্থাপন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তাঁদের প্রাণরক্ষা করতে এগিয়ে আসতেন। বর্মন ও শালস্তম্ভ আদি অসুর রাজবংশের ভাস্কর বর্মন প্রভৃতি রাজাদের ও তার পরবর্তী অহোম রাজবংশের রুদ্রসিংহের মত রাজাদের ইতিহাসে শত্রুকেও তার বিপদের সময় সাহায্য করার ও তার প্রাণরক্ষা করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বখতিয়ার ছলনার আশ্রয় নিয়ে অন্যায় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন—তাই তিনি 'বীরোচিত' ব্যবহার পান নি।

অন্যায় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিলেন—তাই আসামের অসুর নরপতি ও সৈন্যেরা বক্তিয়ারের বিপর্যয়ে তাঁদের স্বাভাবিক মহত্বের প্রেরণায় উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেন। বখতিয়ারের অতর্কিত আক্রমণ ও অন্যায় যুদ্ধের ক্রূরতার জন্যই তাঁদের এই দ্বিধা তাঁদেরকে অগ্রসর হতে দেয়নি।

ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে সনাতন হিন্দু ভারতীয়েরা তাঁদের জীবনের চতুর্বিধ লক্ষ—ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষের জন্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রযত্নশীল হতেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থানুযায়ী তাঁরা বাল্যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জ্ঞান ও ধর্মাদির চর্চা করতেন পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশের উপযোগী হবার জন্য, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমেও ত্রিবর্গের অর্থাৎ ধর্মার্থ কামের সাধনা করতেন, প্রৌঢ়ত্বে বানপ্রস্থাশ্রমেও আশ্রমের উপযুক্ত কর্ম ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করে জীবনের শেষ আশ্রমে—সন্ন্যাস নিয়ে মোক্ষের সাধনা করতেন। বর্ণ ধর্মের দিক থেকে ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত ছিল মোক্ষধর্ম চর্চা। আবার ক্ষত্রিয়-বিহিত ছিল ধর্মার্থ কাম

ও বিশেষ করে রাষ্ট্র রক্ষার কর্তব্য কর্ম। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসারের পর বর্ণাশ্রম ধর্ম বিপর্যস্ত হয়। বর্ণ, আশ্রম ও বয়স নির্বিশেষে সকলেই নির্বাণ বা মোক্ষের সাধনায় রত হন। এদের মধ্যে অধিকারী ও অনধিকারীর কোন ভেদ ছিল না। এর ফলে রাষ্ট্র শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে ক্ষাত্র ও ব্রহ্মশক্তির সমন্বয় ছাড়া ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় সম্ভব নয় (ন ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রং বর্ধতে তপঃ)। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষে ক্ষাত্রশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয় এবং ভারতীয়েরা সকলেই রাজনীতি ও রাজধর্মের চর্চার পরিবর্তে নিবৃত্তি মার্গীয় মোক্ষ বা নির্বাণের চর্চায় নিমগ্ন হন। পূর্বেকার আশ্রম ধর্মও বিপর্যস্ত হয়। অনেকেই স্বল্পবয়সে গার্হস্থ্যাশ্রমে যোগদান না করে বৌদ্ধ সঙ্ঘে যোগদান করতে শুরু করেন। ধর্মাশোকের সময় রাজারা রাজনীতি, রণনীতি, কূটনীতি ও সমরানুশীলন না করে দেশে-বিদেশে ধর্ম প্রচারের দিকে অধিক মনোযোগ দেন। পূর্বে সমরানুশীলন, যুদ্ধযাত্রা, কূটনীতি ও গুপ্তচর প্রশাসন ইত্যাদি কায়িকশ্রম ও মানসিক আয়াসসাপেক্ষ হওয়ায় রাজকার্য সুচারু-রূপে নির্বাহ করার জন্য তাঁদের প্রৌঢ়ত্বেই রাজারা, যুবক উত্তরাধিকারীকে অর্থাৎ যুবরাজকে সিংহাসনের ভার দিয়ে বানপ্রস্থে চলে যেতেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক রাজারা বার্দ্ধক্যেও বাণপ্রস্থে না গিয়ে সিংহাসনে বসে তাঁদের অনায়াস-সাধ্য ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন। শুধু বৌদ্ধ রাজারাই নন তাঁদের প্রভাবে পরবর্তী হিন্দু রাজারাও আর রাজধর্ম ও বর্ণধর্ম পালনে পূর্বেকার মতো নিয়ম নিষ্ঠা রাখতে যত্নশীল হলেন না। তাঁদের রাজধর্মের ও সমরানুশীলনের অবসাদের সুযোগ নিয়েই তুর্কীরা ও তারপর অন্যান্য বহিরাগতেরা ভারতবর্ষে তাঁদের সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্থবির ও অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পরিবর্তে তাঁর কোন তরুণ উত্তরাধিকারীর হাতে নবদ্বীপের প্রতিরক্ষার ভার থাকলে হয়তো বক্তিয়ারের পক্ষে নবদ্বীপ বিজয় এত সহজ হত না। লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীদের রাজনীতি ও সমরকুশলতা সম্বন্ধে আমাদের এ অনুমান যে অসঙ্গত নয় নবদ্বীপ পতনের মাত্র একদশকের মধ্যেই তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁর পৌত্র রাজা রূপসেন। রূপসেন পাঞ্জাবে মুসলমান আক্রমণের সময় তাঁর রাজ্য রূপনগর (রোপাড়) রক্ষার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরগতি প্রাপ্ত হন। এছাড়া লক্ষ্মণ সেনের প্রপৌত্র ও রূপসেনের পুত্র বীরসেন ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন ও একের পর এক রাজপুত রাণাদিকে পরাস্ত

করে ঐ অঞ্চলে একচ্ছত্র সেন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আজকের গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেও রাজশক্তিকে প্রায়শঃই স্থবির রাজনীতিকদের অবসাদের ও ঔদাসীন্যের শিকার হতে দেখা যায়। লক্ষ্মণসেনের মত স্থবির রাজনীতিবিদেরা প্রায়শঃই রাজশক্তিকে ছলেবলে কৌশলে নিজেদের আয়ত্বে রাখতে চান—তাই স্থান পাননা রাজ্যপ্রশাসনে রূপসেন ও বীরসেনের মতন সমর কুশলী, দক্ষ ও সুযোগ্য যুব নেতারা।

কূটনীতি ও রাজধর্মের অনুশীলন ও প্রকৃষ্ট মন্ত্রণা না থাকায় লক্ষ্মণ সেন মিথিলার গহড়বাল রাজশক্তিকে ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর এই অদূরদর্শী আচরণ বক্তিয়ার খলজির নবদ্বীপ জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। ইতিপূর্বে জয়চন্দ্রও মহম্মদ ঘোরীকে আনুকূল্য করে পৃথ্বীরাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করেন; যার ফলে মহম্মদ ঘোরীর পক্ষে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। প্রাচীন রাজনীতি শাস্ত্রের চর্চার অভাবেই এই ভারতীয় হিন্দুরাজারা ও তাঁদের মন্ত্রীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় ডেকে আনেন। দেশীয় রাজার উচ্ছেদ সাধন করে বহিঃশত্রুর রাজ্যলাভে যে রাজা সহায়তা করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করেন। সাম, দান ভেদ বা দণ্ড দ্বারা স্বদেশী রাজাকে স্ববশে বা স্বানুকুল্যে আনাটাই প্রকৃত রাজনীতি। বহুপূর্বে কামান্দক স্পষ্টভাবে তাঁর 'নীতিসারে' এ উপদেশ লিপিবদ্ধ করে গেছেন—

> "যস্মিন্ চ্ছিন্ন মানে তু রিপুরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
> ন তস্যোচ্ছিত্তি মাতিষ্ঠেৎ কুর্ব্বীতৈনং স্বগোচরম্।"

কিন্তু রাজধর্ম ও অর্থনীতির পঠন-পাঠন বৌদ্ধযুগের পর থেকে ক্রমে আসে ও ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সেন বংশের পশ্চিমায়ন :

ইতি পূর্বে আমরা দেখেছি লক্ষ্মণ সেন গাহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চন্দ্রকে বিহার থেকে বিতাড়িত করে বিহার জয় করেন। সম্ভবত- এই অঞ্চলে তাঁর একপুত্র মাধো বা মাধব সেন (মতান্তরে দামোদর সেন) পিতার প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন করতেন। সেন বংশের বিদ্যানুরাগের জন্য তাঁর সভায় বিহার ও মিথিলার কবি, পুরোহিত, জ্যোতিষী প্রভৃতি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিত্বের সমাবেশে একটি বঙ্গ বিহার মিশ্র-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এই সময় বক্তিয়ার খলজির অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপের পতন হয় এবং রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ত্যাগ করে বিক্রমপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে বিহারে তুর্কি প্রাধান্য অপ্রতিহত হয়ে ওঠে—এবং মাধব সেন তাঁর সৈনবাহিনী ও রাজধানী বিক্রমপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর পুত্র সুর (সূর্য) সেনের নেতৃত্বে রাজপরিবারের অনেকেই পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করলেন। বর্তমান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে—পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগে তিনি রাজ পরিবার পরিজন ও সভাসদদের নিয়ে বসবাস শুরু করলেন।

প্রয়াগ থেকে পাঞ্জাব :

ক্রমশ বিহার ও বঙ্গদেশ থেকে অবিরত আশ্রয় প্রার্থী আসতে থাকায় স্থানাভাব ও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকার জন্য সুর সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রূপ সেন এলাহাবাদ থেকে আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন ও অবশেষে পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন নগরের নাম রাখেন রূপনগর।

দিল্লীর সুলতান রূপনগর আক্রমণ করলে রূপসেন তাঁর রাজ্য রক্ষার ও পররাজ্য লোলুপ সুলতানের বিশাল বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজরাজ্য কে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন।

রূপ সেনের প্রতিষ্ঠিত নগর 'রূপনগর'। নামটি কালক্রমে 'রোপাড়' নামে পরিচিত হয়। বুঝি বা অসম শক্তির আক্রমণ থেকে স্বরাজ্য রক্ষা করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি যে দুঃখ গ্লানি ও বেদনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারই অশ্রুসিক্ত

ইতিহাস বহন করে চলেছে 'রোপড়' নামটি! 'রোপাড়' কথাটির অর্থ হল কেঁদে ফেলা। ("রো=কেঁদে—পড়=ফেলা) রূপনগরের রাজলক্ষ্মী আজও যেন অশ্রুবিসর্জন করেন বঙ্গের বীর রাজপুত্র রূপ সেনের আত্মবলিদানের জন্য ॥

রূপ সেন ছিলেন তিন পুত্রের পিতা—বীরসেন, গিরি সেন ও হামির সেন। তাঁরা পাঞ্জাবের সমভূমি থেকে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন—গিরিসেন কেওনথলে হামিরসেন কিস্তোয়ারে ও বীরসেন অগ্রসর হন সুকেতের দিকে।

বীরসেন ঃ

সেন রাজবংশের সুকেত অধ্যায় শুরু হয় ১২১১ খ্রীঃ থেকে। রূপসেন রোপাড়ে সেন রাজ্যের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা ছিল পঞ্চনদের বালুকা বেলায় স্বপ্নের সোনালী রাজপ্রাসাদ কিন্তু বীরসেন হিমাচলের সুকেত ও মাণ্ডিতে সেন রাজ্যের ভিতকে সুদৃঢ় করে বাস্তবের রাজপ্রাসাদের উপযোগী করে তোলেন। তিনি সেন বংশ তথা বঙ্গবাসীদের বীরত্ব, ও যুদ্ধ কৌশল ও মর্যাদাকে উত্তর পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

সুকেতে অবস্থানের সময় বীরসেন বুঝেছিলেন যে তাঁর রাজ্যের ভিতকে সুদৃঢ় করতে হলে এবং সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে গেলে পার্শ্ববর্তী রানাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন সেহেতু তিনি একের পর এক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করে সেন রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করেন তাঁর এই স্থায়ী আধিপত্য কায়েম করার পেছনে ছিল তাঁর নিজস্ব বুদ্ধিবল, তাঁর সৈন্যদলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভাই গিরি-সেনের সুদক্ষ সেনাপতিত্ব ও কুলুরাজ্যের সাহায্য। তবুও প্রজাদের একটি গোষ্ঠী বীরসেনের এক সম্পর্কিত ভাইকে রাজা করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়াতে বীর সেনের রাজসভা ছেড়ে জায়গিরে ফিরে যেতে বাধ্য হন ভাই বাহু সেন।

হিমাচলের পাহাড়ী নদীকে সাধারণতঃ নৌযুদ্ধে ব্যবহার করার কৌশল স্থানীয় লোকেদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। অন্যদিকে নদীমাতৃক উষ্ণ সমুদ্র তটাশ্রয়ী রাঢ় ও বঙ্গ জনগোষ্ঠী সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই নৌচালনা ও নৌযুদ্ধে পারদর্শী। কালিদাস তাঁর রঘু বংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাঙালীকে 'নৌপাঠ নোদ্যতান' বলে বর্ণনা দিয়েছেন ষষ্ঠ শতকের মৌখরী রাজ ঈশান বর্মার হড়াহ। লিপিতে গৌড়বাসীদের 'সমুদ্রাশ্রয়ান' বলা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় বাঙালীরা উত্তাল সমুদ্রেও পোত চালনায় সক্ষম ছিলেন। পাল ও সেন বংশের

সেন রাজন্যবর্গের দক্ষিণ থেকে পূর্বায়ণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমায়নের পথ
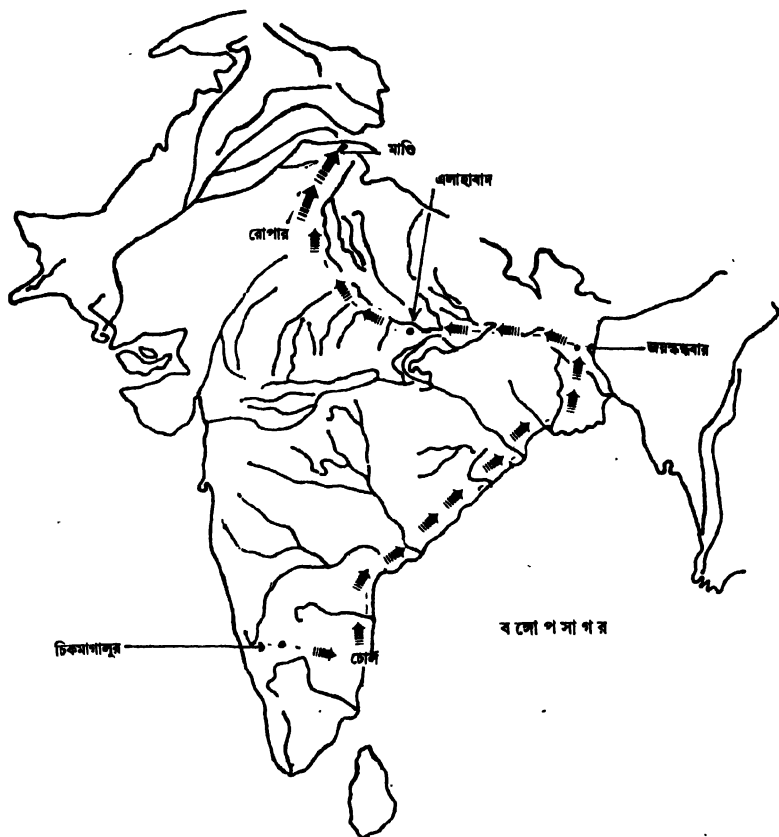
বিভিন্ন লিপিতে 'নৌবাট', 'নৌবিতান' প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে নৌবাহিনীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া বৈদ্যদেবের 'কমৌলি লিপিতে। দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌযুদ্ধের চমৎকার বর্ণনা আছে :—

যস্যামুত্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে নৌবাটহীহীরব—
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদগম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতন প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈর্
আকাশে স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ।।*

* অনুবাদ : যাঁর দক্ষিণবঙ্গ যুদ্ধজয়ে নৌবাহিনীর হীহী রবে ত্রস্ত হয়ে দিস্‌গজেরা যে পালায় নি তার কারণ তাদের পালাবার জায়গা ছিল না। উপরন্তু দাঁড়ের উৎক্ষিপ্ত জলকণা যদি আকাশে স্থির হয়ে থাকতো তাহলে চন্দ্রের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে যেতো।

বলা বাহুল্য পারদর্শী বাঙ্গালী নৌসেনা থাকায় নৌযুদ্ধে বীরসেনই জয়লাভ করেন।

স্থানীয় রাজপুত রানা সানিয়ার্তো ছিলেন স্বাধীনচেতা ও যথার্থ বীর। তিনি নিজেকে ঐ অঞ্চলের অধিরাজ মনে করতেন। সুতরাং বীরসেনের বিজিত রাজ্যগুলির উপর তিনি বীরসেনের প্রাধান্য মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সানিয়ার্তো বীরসেনকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করেন। তিনি বলেন, যতক্ষণ না বীরসেন তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হন, ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় পার্বত্য রাজ্যগুলি বীরসেনের প্রাধান্য মেনে নিতে পারে না। এরপর বীরসেন সৈন্যসংগ্রহ করে সানিয়ার্তোকে আক্রমণ করেন। সুযোগ বুঝে বীরসেন মসিল দুর্গটি অধিকার করেন এবং দীর্ঘদিন সেটি স্বাধিকারে রাখেন। সেখান থেকে তিনি শক্তিসঞ্চয় করেন ও পুনরায় সানিয়ার্তোকে আক্রমণ করেন এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাঁর অধীনস্থ মসিল দুর্গ, কাজুনের থানা ও ধিংড়াকোট প্রভৃতি দুর্গ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর তিনি রানা দেওপালকে সহজেই পরাজিত ও বন্দী করেন। ক্রমশ সমগ্র অঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তিনি রানা দেওপালকে কিছু জায়গীর দিয়ে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন। রানার বংশধরেরা সেনবংশীয় রাজা শ্যামসেনের রাজত্বকাল পর্যন্ত জায়গীরটি নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হন।

বীরসেন সপরিবারে বসবাসের জন্য পাণ্ডনা নামে একটি প্রাসাদনির্মাণ করেন, সেটি ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানটি এখনও 'নারোল' (অর্থাৎ নিরালা) নামে পরিচিত। অতঃপর কাজুন থানার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে

তিনি বহু পার্বত্য রাজ্য অধিকার করেন ও কাংড়ায় দুইটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তারপর তিনি শতদ্রু নদের পশ্চিম ও দক্ষিণ তীরের রাজপুত রাজ্যগুলি আক্রমণ ও অধিকার করেন। তা'তে তিনি স্থানীয় রাণাদের কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ না পাওয়ায় তাঁর আক্রমণাত্মক অভিযান অব্যাহত রাখেন। এরপর তিনি বীরকোট দুর্গটি অধিকার করে অন্যান্য বহু দুর্গ ও পার্বত্য রাজ্য হস্তগত করেন। তাঁর অপ্রতিহত ও দুর্দমনীয় অভিযান প্রতিহত করার জন্য কুলুর সাহসী, বীর ও স্বাধীনচেতা রাজা অগ্রসর হন। কিন্তু রাজা বীরসেন বীরদর্পে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। বন্দী কুলুরাজ বীরসেনের বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁকে বার্ষিক কিছু কর ও উপঢৌকন দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। বিনিময়ে বীরসেন তাঁকে বন্দীদশা থেকে মুক্তিদান করেন। অতঃপর বীরসেন উত্তর ও পশ্চিমের অসংখ্য রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন ও বিজয় চিহ্নস্বরূপ বীরকোট (বর্তমানে বিহারকোট) নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

সুকেতের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সবদিকেই বীরসেনের বীরত্বের স্বাক্ষর দেখা যায়। বীরত্বের দিক থেকে বিচার ক'রলে তাঁর মতো বীর ও প্রভাবশালী রাজা সেনবংশে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। আকবর যেমন একাধারে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তার স্থায়িত্বের জন্য সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বীরসেনও তেমনি সেনরাজত্বের বিস্তার সাধন ও তার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন। জীবনের প্রারম্ভে তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁর সেই স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল সগৌরবে রাজত্ব করার পর শ্রেষ্ঠবীর রাজা বীরসেন যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন। হিমাচলে সেনসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকাররূপে রাজা বীরসেনের নাম বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সুকেত ও বঙ্গের যোগাযোগ ঃ—

হিমাচলের বৌদ্ধতীর্থ সুকেতে এই বাঙ্গালী অভিবাসনে এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে রূপনগর ত্যাগ করার পর—কেন রাজপুত্র বীরসেন সুকেত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? তিনি কেমন করে সুকেতের পথ জানলেন ? এই প্রসঙ্গে বলা যায় সুকেত একটি প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধতীর্থ ক্ষেত্র। এখানে লোমশমুনির একটি মন্দির আছে। শোনা যায় পুরাকালে এখানেই লোমশমুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে সুকেতের কর্ণপুর গ্রামটির নাকি

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহাভারতের দাতাকর্ণ। আর পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধন কর্তৃক জতুগৃহ দাহের ঘটনাবিফল হওয়ার ঠিক পরে নাকি এখানকার গুমা নামে একটি গ্রামেই আশ্রয় নিয়েছিলেন—আত্মগোপন করে থাকার জন্য। স্কন্দ পুরাণেও সুকেতের 'রিবালসর' নামে একটি সরোবরকে তীর্থস্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবও (খৃঃ ৭৫০—৮০০) এই রিবালসরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিব্বতের রাজা তিসান্-দেচান ও ভূটানের সিন্ধুরাজের আহ্বানে তিনি ভারত থেকে তিব্বতে ও ভুটানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ইত্যাদি প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের নাম ছিল 'নিঙ্‌মাপা' সম্প্রদায়। বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবের জন্মস্থান হওয়ায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (Chhosbyung) এ ও সুকেতের রিবালসরকে বৌদ্ধতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুকেতের রিবালসরের সঙ্গে বঙ্গদেশের বৌদ্ধতীর্থ যাত্রীদের গমনাগমনের ফলে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান শুরু হয়েছিল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধগুরু পদ্মসম্ভবের আবির্ভাবের সময় থেকেই।

হিমাচলের গুরু পদ্মসম্ভবের বঙ্গদেশ, কামরূপ ও ভুটানযাত্রা :

উত্তরবঙ্গের রাজা নাবুদর গুরুপদ্মসম্ভবের শিষ্যছিলেন, সিকিমের দক্ষিণে তাঁর রাজ্য নাটঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাবুদর ছিলেন দীর্ঘ নাসাবিশিষ্ট সংস্কৃত ভাষী রাজা। তাই ভূটান ও তিব্বতের ধর্মের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থে তাঁকে 'নাওচে' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। এই রাজা নাবুদরের সঙ্গে মধ্য-ভূটানের সিন্ধু রাজের সীমানা নিয়ে বিবাদ বেধে গিয়ে ছিল।

নাবুদরের সঙ্গে যুদ্ধে সিন্ধুরাজার বহুসৈন্যের ও এমনকি রাজপুত্রেরও প্রাণনাশ হয়। প্রতিহিংসার বশবর্তী হ'য়ে উভয় রাজাই তাঁদের সীমানার গ্রামগুলিকে জালিয়ে দেওয়ায় নিরীহ প্রজাসাধারণ ও তাদের পরিবার বর্গের প্রাণহানি ও ধন-সম্পত্তির বিনাশ ঘটে। এইভাবে তাঁরা বহু দুঃখ ও ক্লেশের সম্মুখীন হন। সিন্ধু-রাজ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পাড়েন। তাঁর উপদেষ্টাদের পরামর্শে তিনি নাবুদরের গুরু পদ্মসম্ভবকে তাঁর রাজ্যে পীড়া ও ক্লেশাদির শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের জন্য আমন্ত্রণ করেন। গুরু পদ্মসম্ভব তাঁর আমন্ত্রণে প্রাগ্‌জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে হাতিশরে পৌছান। সেখান থেকে সামগাঁও এর পার্বত্য পথ দিয়ে বুমথাং (ভূমিস্থানে) পৌছান। বুমথাং এর রাজা ও প্রজা সকলেই গুরুপদ্মসম্ভবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুপদ্মসম্ভব কেবল রাজার রোগ শান্তির প্রচেষ্টাই করেননি তিনি তাঁর দুই শিষ্য

সিন্ধু রাজ ও নাবুদরের মধ্যে সন্ধি ও মৈত্রীস্থাপনের ব্যবস্থাও করেন। এখনও সিন্ধুরাজের নয়তলা কেল্লার ধ্বংসাবশেষ বুমথাং-এ দেখতে পাওয়া যায়। গুরু পদ্মসম্ভবের খ্যাতি ভুটান থেকে বঙ্গ, বিহার ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিস্তৃত হয়। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ তিব্বত ও ভুটান তাঁর শিষ্যে পরিপূর্ণ হয়।

বঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা ঃ খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকেই প্রতিবৎসর ভুটান, প্রাগজ্যোতিষ ও বঙ্গদেশের সিদ্ধাচার্যেরা এবং বৌদ্ধতীর্থযাত্রীরা গুরু পদ্মসম্ভবের জন্মস্থান রিবালসরে তীর্থ করতে যেতেন। বাঙালী শ্রীঅতীশ দীপংকরের শিষ্য ভুসুকু ছিলেন বিক্রমপুরের বাসিন্দা। পাগসাম্ জোনজাঙ্গ গ্রন্থে লুইপাদকে "উড্ডীয়ান বিনির্গত" বলে উল্লেখ করা হ'লেও সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন এক বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও ডাকিনীদের দেশ থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম উদ্ধার করে আনেন। অর্থাৎ তিনি দেশান্তরের তান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি শিখে এসে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করেন। বঙ্গ দেশের পার্বত্য ভূমির শবররূপে পরিচিত ছিলেন আচার্য সিদ্ধপুর।

বন্, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের সমীকরণে সেনরাজাদের অবদান—

গুপ্ত ও পাল যুগ থেকেই যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অন্তরালে মিলন ও সমন্বয়ের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রূপ কল্পনায় সেন, পাল ও চন্দ্রবংশের রাজাদের মিলন ও সমন্বয়ের প্রতি আগ্রহের প্রকাশ রূপে উভয় ধর্মাবলম্বীদের দেবায়তনে উভয় সম্প্রদায়ের দেবদেবীর সহাবস্থান দেখা যায়।

বৌদ্ধ আয়তনের সরস্বতী, বিঘ্ননাশক, বিনায়ক প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবী স্পষ্টতই ব্রাহ্মণ্য আয়তন থেকে গৃহীত। চণ্ডিকা ও মহাকালের অস্তিত্বও দুই আয়তনেই দেখা যায়। ধ্যানী বুদ্ধের আদর্শ অনুযায়ীই পরিকল্পিত হয়েছে যোগাসনে ধ্যানীশিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি। যদিও শিব লিঙ্গরূপে প্রাক বৌদ্ধ যুগেই পুজিত হয়েছেন। বৌদ্ধ প্রতিমা ও ধ্যানী বুদ্ধের স্বরূপ অনুযায়ীই রচিত হয়েছে ব্রাহ্মধর্মে বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের-উপরি ভাগে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্তি। বৌদ্ধ আয়তনের দেবী তারা ব্রাহ্মণ্য আয়তনের দশমহাবিদ্যার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কালী এবং দুর্গার সঙ্গে স্থান পেয়েছেন।

'যোগিনীতন্ত্র' ও 'রুদ্রযামল' গ্রন্থে জনৈক বশিষ্ঠ ঋষির কথা পাওয়া যায়— যিনি 'মহাচীন' থেকে চীনাচারতন্ত্র এবং তারার আরাধনা ও পূজাপদ্ধতি এনে

আসামের নীলাচল অঞ্চলে প্রথমে প্রবর্ত্তন করেন। পরে তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এই বশিষ্ঠ ঋষি অবশ্যই রামায়ণের ইক্ষ্বাকু বংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ নন। তিনি পরবর্তীকালের বশিষ্ঠগোত্রীয় কোন তান্ত্রিক সাধক হওয়াই সম্ভব— যিনি বৌদ্ধদেবী তারাকে হিন্দু দশমহাবিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। গৌহাটীর দিসপুরে যে বশিষ্ঠের আশ্রম দেখা যায় এটি সম্ভবতঃ ; এই পরবর্তী বশিষ্ঠেরই আশ্রম—কেননা এখান থেকে মহাচীনও অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। বর্তমান লেখকের Cultural History of Bhutan গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এযুগের ধর্মসমন্বয়ের কথা আলোচনা করতে গিয়ে ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস গ্রন্থে—উমা ও পদ্মাবতী যে বেদমাতা থেকে ভিন্ন নন—সে কথা প্রতিপন্ন করতে লেখা একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করেছেন :

দেবী ত্বমেব গিরিজা কুশলা ত্বমেব
পদ্মাবতী ত্বমসি [ত্বং হি চ] বেদমাতা।
ব্যাপ্তং ত্বয়া ত্রিভুবনে জগতৈ—কন্ধপা
তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ
যানত্রয়েষু দশপারমিতেতি গীতা
বিস্তীর্ণ যানিকজনা কক্ষশূন্যতেতি।
প্রজ্ঞাপ্রসঙ্গ চটুলামৃতপূর্ণধাত্রী
তুভ্য নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরানঃ ॥
আনন্দনন্দ বিরসা সহজ স্বভাবা
চক্রত্রয়াদ পরিবর্তিত বিশ্বমাতা।
বিদ্যুৎপ্রভা হৃদয়বর্জিত জ্ঞানগম্যা
তুভ্যং নমোহস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকায়তন ও সাঙ্গীকরণ শক্তি বৌদ্ধধর্মের চেয়ে বোধহয় বেশি ছিল। পালযুগের গোধুলিলগ্নে নালন্দা মহাবিহারের ক্রমাবনতি শুরু হয়। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় পূজা, প্রতিমা ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যবধান ক্রমশঃ মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে থাকে। লোকের মনে দেবতার প্রতিকৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মে কোনও অসুবিধা ছিল না। সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গাপূজার আড়ম্বর ও স্বীকৃতি আরও বৃদ্ধিপায়। তখনকার দিনে মানুষের মনে ধর্মবিষয়ক যে প্রভাব বর্তমান ছিল তাতে

বৌদ্ধধর্মাচরণ সমাজে ক্রমশ ম্লান হয়ে আসাই স্বাভাবিক ছিল। যেমন-সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের পূজার্চনায় দেখা যায় আজও প্রাচীন রীতি অনুসারে বাংলার মেয়েরা মাটির তৈরি যে শিবলিঙ্গের পূজা করে থাকেন, সেই শিবলিঙ্গের মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়, তার নাম 'বজ্র'। বেলপাতা দিয়ে বজ্রটি সরিয়ে দিলে তবে মূর্তি শিবে পরিণত হয় এবং পূজার যোগ্য হয়।

বেশ কিছু কবি ও লেখক বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেব-দেবীদের সঙ্গে সমীকরণে (syncretism) তৎপর হয়েছিলেন। তাই তাঁরা বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার বলে স্বীকার করেছেন। তারাকে কালীরই একরূপ বলে গ্রহণ করেছেন। এই স্বীকৃতি ক্রমশ অনুরক্তিতে পরিণত হয়েছে। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মণ কবি মাঘ তাঁর শিশুপালবধ কাব্যে বুদ্ধের প্রতি তাঁর সপ্রশংস শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন। পদ্ম পুরানের ক্রিয়াযোগসারে দশাবতার স্তুতিতে বুদ্ধাবতার বেদবিরোধী বলেই তাঁকে নমস্কার জানানো হয়েছে। "তুমি পশুহত্যা অবলোকন করিয়া কৃপাযুক্ত হইয়া বুদ্ধশরীর গ্রহণপূর্বক বেদসকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি যজ্ঞনিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।" লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি তাঁর গীতগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রে বিষ্ণুর বুদ্ধ অব-তারের স্তুতি করেছেন--

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয়দরশিত পশুঘাতম্,
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

নৈষধ রচয়িতা শ্রীহর্ষ যদি বাঙালিই হয়ে থাকেনে তাহলে তিনিও সমসাময়িক বাঙালির মনকেই ব্যক্ত করেছেন মারজয়ী জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধের কথা, তাঁর ক্ষমা-শীলতা ও সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করে। এইভাবে ক্রমশ বেদবিরোধী বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্য ধ্যানের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন। বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ওব্রাহ্মণ্য ধর্মের তন্ত্র মার্গী সাধনা মিলেমিশে প্রায় এক হয়ে গেল। ফলে সেন রাজত্বকালে বৌদ্ধ দেবায়তন ও ব্রাহ্মণ্য দেবায়তনে প্রতিমার রূপকল্পনার পার্থক্যও অনেকখানি দূরীভূত হল। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মকে সক্রিয় ও সচেতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এই সাঙ্গীকরণের সূত্রপাত করে গিয়েছেন বঙ্গের সেনরাজারাই।

বিহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেখানে সংঘারামগুলিতে তখন ধর্মচেতনা সক্রিয় ছিল। তবে বর্মন সেন আমলে তার পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। ইতিহাসের

চক্রাবর্তে তার প্রভাব ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। সেই সময় নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী মহাবিহার তুর্কি সেনার তরবারি ও অশ্বক্ষুরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়, হাজার হাজার পুঁথি বিনষ্ট হয়, শত শত শ্রমণ হাসিমুখে প্রাণবিসর্জনদেন। তারপর অগ্নিতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। যাঁরা কোনও মতে প্রাণ বাঁচাতে পেরে ছিলেন তাঁরা যে কটি পুঁথি, ক্ষুদ্রমূর্তি ও প্রতিমা এবং সূত্রোৎকীর্ণ মাটির ফলক সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাই ঝুলিতে ভরে তিব্বত, নেপাল, কামরূপ, উড়িষ্যা, আরাকান পেগু, পাগান ও আরও দূরদেশে প্রস্থান করেন। বর্তমানে সেইসব গ্রন্থেরই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে কখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছে যায়। মিনহাজ, তারানাথ, বুদ্ধগুপ্ত প্রমুখ সকলেই ইতিহাসের এই উত্থান পতনের অল্পবিস্তর বর্ণনা রেখে গেছেন। সেন-বর্মন পর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর কোনও বিরোধ ছিল বলে মনে হয় না ব্রাহ্মণ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের দৃষ্টান্তও প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে নেই বললেই চলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরিহরের যুগলমূর্তি এক সহৃদয় চেতনার প্রকাশ বলে মনে হয়। লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেন তিনজনেই তাঁদের লিপি আরম্ভ করেছিলেন নারায়ণকে প্রণতি জানিয়ে। এঁদের প্রত্যেকেরই রাজকীয় সীলমোহরে যাঁর প্রতিমা উৎকীর্ণ, তিনি নিজে প্রাক্ বৌদ্ধধর্মের সদাশিব (Kuntuzanpo) যদিও সামন্ত সেন থেকে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত সকলেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন ছিলেন সূর্য ভক্ত ও তাঁরা দুজনেই নিজেদের পরম সৌর বলে পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় সেনেরা পরবর্তীকালে হিন্দু পঞ্চদেবতার উপাসনা গ্রহণ করলেও বন্‌দেবতা সদাশিব (Kuntuzanpo) তাঁদের সকলেরই কুলদেবতারূপে পূজিত হতেন।

সেন রাজবংশ যখন পূর্ববঙ্গে অধিষ্ঠিত তখনও বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপিতে গৌড়েশ্বর পরম রাজাধিরাজ মধুসেন নামে জনৈক রাজার উল্লেখ আছে। এই মধুসেন কোন রাজবংশ সম্ভূত বা তাঁর রাজত্বের ভৌগালিক অবস্থান সম্পর্কে তথ্য নেই, তবে তিনি যদি সেন বংশোদ্ভব হন তাহলে লক্ষ্মণসেনের বিক্রমপুরবাসী কোনও উত্তর পুরুষের বংশধর হওয়াই সম্ভব। মধুসেনের বৌদ্ধধর্মানুরক্তির মধ্যদিয়ে এবং অন্যান্য সেন রাজারা তাঁদের ধর্মাচরণে বন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীদের সমীকরণে এতদঞ্চলের ধর্মসমন্বয়ের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেগেছেন। গঙ্গাতীরের

হিন্দুতীর্থ নবদ্বীপে যেমন তাঁরা বাস করেগেছেন তেমনি বাস করেছেন বৌদ্ধতীর্থ রিবালসরে।

ধীরসেন—বীরসেনের উত্তরাধিকারী ধীরসেন মাত্র সাত বছর রাজত্ব করেন সুকেতের এই রিবালসরে। বীরসেনের বিক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সমস্ত রাজারা বশ্যতা স্বীকার করায় ধীরসেনের রাজত্বকালের সাত বছরে কোনও বহিরাক্রমনের ঘটনা ঘটে নি। ধীর সেন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। ধীরসেনের পরে বিক্রমসেন সিংহাসনে বসেন।

বিক্রমসেন—সেনবংশের পূর্ববর্তী রাজাদের মতই বিক্রমসেন খুব ধার্মিক প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সামন্তসেন বার্ধক্যে রাঢ়ের গঙ্গাতীরবাসী হয়েছিলেন এবং রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন নদীয়ার গঙ্গাতীরে তাঁদের তীর্থনিবাস নির্মাণ করেছিলেন। শূরসেন নদীয়া ত্যাগ করে পশ্চিমে গেলেও গঙ্গার ত্রিবেনী সঙ্গম প্রয়াগে বসবাস করেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকায় বিক্রমসেনের মনও গঙ্গাস্নানের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সুকেত থেকে গঙ্গাতীর তো ছিল বহুদূর। তবুও এই সেনরাজ তাঁর রক্তের মধ্যে কলনাদিনী ভাগীরথী গঙ্গার আহ্বান অহরহ অনুভব করতে থাকেন এবং অন্তত হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গাস্নান ও পিতৃপুরুষের তর্পণের জন্য উদগ্রীব হন। অবশেষে তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা ত্রিবিক্রমসেনকে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে তিনি তীর্থ যাত্রায় রওনা হন।

রাজ্যের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার লোভ যাতে মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত না করে—সেইজন্যই বুঝি রামায়ণে ভরতের চরিত্রচিত্রণ করা হয়েছিল! কিন্তু ত্রিবিক্রমসেন ত্রেতাযুগের ভরতের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণে সক্ষম হননি। দ্বাপর-যুগে পাণ্ডবরা বনবাস থেকে ফিরে রাজ্য দাবি করলে কৌরব যুবরাজ দুর্যোধন রাজ্যমোহে তা ফিরিয়ে দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। এখানে ত্রিবিক্রমসেনও সেই বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত মেনে লোভের বশবর্তী হয়ে ভ্রাতার রাজ্যটি কুলুর রাজা হায়াত পালকে অধিকার করতে দিলেন। বিক্রমসেন তীর্থভ্রমণের পর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পান। এরপর বিনাযুদ্ধে স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভবনা না থাকায় তিনি তাঁর জ্ঞাতি ও আত্মীয় কেওনথলের রাজার কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান। এই সাহায্যে বলীয়ান হয়ে বিক্রমসেন ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। পরে

শতদ্রু নদীর তীরে সিউড়িতে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। কুলুর রাজা হায়াতপাল ত্রিবিক্রমের পক্ষে যোগ দেন। কিন্তু যুদ্ধে কুলুর রাজা ও ত্রিবিক্রমসেন পরাজিত ও নিহত হন, বিক্রমসেন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এরপর কুলু রাজ্যটিও তিনি নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু তিনি কুলুর রাজপরিবারবর্গের ভরনপোষণের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন। ধর্মযুদ্ধ ও আশ্রিত পালনে তিনি ক্ষাত্রধর্মের দৃষ্টান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। বিক্রমসেন মাত্র দশবছর রাজত্ব করে পরলোকগমন করেন।

ধরিত্রীসেন—বিক্রমসেনের উত্তরাধিকারী ধরিত্রীসেনও বেশিদিন রাজত্ব করেন নি। তাঁর রাজত্বে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তিনি তাঁর জীবিত অবস্থাতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারান। তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের নাম **খড়্গ সেন**। খড়্গসেনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন—খড়্গসেনের স্বল্পকাল রাজত্বের পর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন পিতার সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তখন তার বয়স মাত্র দুই বৎসর। এই নাবালক পুত্র সিংহাসন লাভ করায় কুলুর রাজা সহজেই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় নাবালক রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কিন্তু কুলুরাজের মন্ত্রীরা এই নীতি বিরুদ্ধ কাজে বাধা দেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় কুলু রাজার বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান আরম্ভ করেন এবং ওয়াজিরিস, রুপি, লেগ প্রভৃতিরাজ্য জয় করেন। তিনি পচিশ বছর রাজত্ব করার পর লোকান্তরিত হন।

বিজয়সেন—দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের পুত্র ছিলেন চন্দরসেন (চন্দ্র সেন)। তিনি ১০ বছর শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেন। পরবর্তী রাজা হন তাঁর পুত্র বিজয়সেন। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর সগৌরবে রাজত্ব করেন।

সাধুসেন—বিজয়সেনের পুত্র সাধুসেন উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা বাহুসেনের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই যুদ্ধ বিগ্রহই ছিল তাঁর রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহুসেন কুলুরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মাণ্ডিপর্ব

এই ভাবে বংশ পরম্পরায় এগার জন রাজা রাজত্ব করার পর সেন বংশীয় রাজারা মাণ্ডিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা চিন্তা করেন।

রতন সেন—সাধুসেনের উত্তরাধিকারী ছিলেন রতন সেন। তাঁর রাজত্ব কালও ছিল শান্তিপূর্ণ। তাঁর দুই পুত্র বিলাসসেন ও সমুন্দর সেনের (সমুদ্র সেন) মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাসসেন সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও অসহযোগ বৃদ্ধি পায় ও তিনি বিষপ্রয়োগে নিহত হন। এই ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের যোগ ছিল। তারা সঙ্কল্প করে যে বিলাসসেনের শিশুপুত্র শ্রীমন্ত সেনকে হত্যা করে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমুদ্র সেনকেই সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলে গ্রহণ করবে। প্রজাদের অভিসন্ধি জানতে পারায় শ্রীমন্ত সেনের মাতা শিশুপুত্র শ্রীমন্ত সেনকে নিয়ে ছদ্মবেশে জনৈক জমিদার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করার পর এক সন্ন্যাসী তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে তাঁর পুত্র একদিন রাজ সিংহাসন লাভ করবে। ইত্যবসরে সমুদ্রসেনকেই সিংহাসনে বসান হয়েছিল ও তাঁর দুই পুত্র হেমন্তসেন ও বলবন্ত সেনকে রেখে তিনি পরোলোক গমন করেন। কিন্তু তাঁর দুই পুত্রই অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যান। অতঃপর সেন রাজসিংহাসন উত্তরাধিকারী শূন্য হওয়ায় নিরুপায় প্রজা সাধারণ শ্রীমন্ত সেনেরই অনুসন্ধান করতে বাধ্য হন।

শ্রীমন্ত সেন—শ্রীমন্ত সেনের সন্ধান পাওয়ায় প্রজাগণ তাঁর রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করেন। রাজা শ্রীমন্ত সেন শৈশবের আশ্রয় দাতা সিরাজের জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে জায়গীর স্বরূপ একটি গ্রাম দান করেন। সেখানে তিনি তাঁর দুঃখিনী মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে "রানীকাকোট" নামে একটি সৌধ নির্মাণ করেন। এই ভবনটি কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেলেও সুকেতের এই তালুকটি এখনও "রানীকোট" নামে শ্রীমন্ত সেনের মাতৃবন্দনার নিদর্শন হয়ে আছে!

উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব

শ্রীমন্তসেনের পর পরবর্তী পাঁচজন রাজা নামে মাত্র রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিহীন। পঞ্চম রাজা মন্ত্রসেন ছিলেন নিঃসন্তান। অতঃ পর রাজ সভার সভাসদবর্গ ও মাণ্ডির প্রজাবর্গ নিঃসন্তান রাজার প্রপিতামহের ভ্রাতা লিয়ানফিয়ানকে উত্তরাধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু লিয়ানফিয়ানের নামটিইযে কেবল সেনবংশীয় রাজাদের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যবিহীন ছিল তাই নয়—তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ও আচার-আচরণও প্রজাদের আশানুরূপ ছিলনা। তাই রাজোচিত গুণসম্পন্ন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য তাঁরা একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাঁরা

একটি আয়োজিত ভোজ সভায় পান—ভোজন চলাকালে একটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা উত্থাপনের কথা স্থির করেন এবং সেই সমস্যা সমাধানে যে ব্যক্তি অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিবেন তাঁকেই রাজা নির্বাচন করা স্থির হয়। এই পরিকল্পানুযায়ী আয়োজিত ভোজ চলাকালে এক ভগ্নদূত এসে সংবাদ দেয় যে নাচনীর রাণা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি গ্রামে অগ্নিসংযোগ করেছেন। উত্তরে লিয়াণ-ফিয়ান ভগ্নদূতকে জানান যে ভোজসভার পান-ভোজনের সমাপ্তির পর যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ভোজন-রতদের মধ্যে জনৈক মিঞা মদন তৎক্ষণাৎ পান-ভোজন পরিত্যাগ করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঘোষণা করেন যে অগ্নিসংযোগে যখন মানুষের ধন-প্রাণ-বিপন্ন তখন আর পান ভোজন চলেনা। তিনি কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ-দমন ও অগ্নি নির্বাপনের জন্য যাত্রা করছেন। অন্যদের তাঁকে অনুসরণ করতে বলে তিনি উপদ্রুত গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি রওনা হবার পরই প্রজারা সর্বসমক্ষে আলোচনা করে মিঞা মদনকেই রাজসিংহাসনের যোগ্যতম অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে মিঞা মদনই সেন রাজ সিংহাসনে রাজা নির্বাচিত হ'লেন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

উপরের এই ঘটনাটিতে একদিকে (১) যেমন রাজপরিবারের অভিজাত ধারার পরিবর্ত্তন দেখা যায়—বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের স্থলে অনভিজাত নির্বাচিত রাজা সিংহাসন লাভ করেন। অপরদিকে (২) বঙ্গের ইতিহাসের রাজা নির্বাচনের পূর্বতন একটি অধ্যায়ের ও পুনরাবৃত্তি দেখা যায় হিমাচলে।

(১) গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেন যখন মধ্যাহ্ন ভোজনে রত ছিলেন তখন বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর নবদ্বীপ আক্রমণ সংঘটিত হয় ও রাজা যথেষ্ট ত্বরান্বিত ভাবে তার মোকাবিলা করতে না পারায় নবদ্বীপ তাঁর হস্তচ্যুত হয় তেমনি দুইশত বৎসর পরে লক্ষ্মণ সেনের এক উত্তরাধিকারী লিয়ানফিয়ানকে ও ভোজসভা পরিত্যাগ করে ত্বরান্বিত ভবে বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হতে নাপারায় মাণ্ডির রাজ-সিংহাসন হারাতে হয়। অনভিজাতেরা সিংহাসনে বসেন।

(২) ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিটি হ'ল যোগ্যতানুসারে জনগণের রাজা নির্বাচন। বঙ্গ দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য বাংলার জনগনই খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি গোপালকে বাংলার রাজা নির্বাচন করেন। খালিমপুর লিপিতে তিনটি মাত্র শ্লোকে গোপালের বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকটিতে

বোঝায় গোপাল ছিলেন দয়িত বিষ্ণুর পুত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে মাৎস্যন্যায় নিবারণ করার জন্য বঙ্গের জনগণ গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন।

পরিস্থিতির চাপে হিমাচলে জনগণও সেন বংশের সিংহাসনে গোপালের ন্যায় অনভিজাত ব্যক্তি—মদন মিঞাকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন তাঁদের মধ্যে বঙ্গীয় সভাসদদের উত্তর পুরুষেরাও ছিলেন। এঁরা হয়ত সচেতনভাবেই বঙ্গের প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু মিঞা মদন সাধারণ মিলমালিক হওয়ায় রাজকীয় কোন আভিজাত্য, বা আকৃতি-প্রকৃতি বা তাঁর আচার আচরণেও সেন রাজ বংশের কোন অনুরূপ গুণ খুঁজে পাননি অধ্যাপক মনমোহন। মদন নামের সঙ্গে মিঞা শব্দটি যুক্ত থাকায় তাঁকে অভিজাত ও আমাত্যদের কাছাকাছি একজন মনে করাই স্বাভাবিক ছিল।

নির্বাচিত রাজা মদন সেন

মিঞা মদন, মদন সেন নাম গ্রহণ করে সেন বংশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি নাচনি রাজ্যটি আক্রমন করেন। তখন নাচনির রানা পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু বন্দীরাজা মিঞা মদনকে জানান যে, তিনি আদৌ-বিদ্রোহ করেননি। সুতরাং তিনি নিরপরাধ। এরপর মিঞা মদন বুঝতে পারলেন যে, নাচনির রানার বিদ্রোহের কাহিনীটি কল্পিত হয়েছিল সেনবংশের শূন্য সিংহাসনের যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচনের পরীক্ষা হিসাবে। সেনবংশের সিংহাসনে ইনিই প্রথম নির্বাচিত রাজা। মিঞা মদন সেনরাজবংশকে বীরোচিত মর্য্যদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রথমেই তিনি মদন কোট নামে একটি দুর্গ-নির্মান করেন। এই দুর্গটি অধুনা মরদানগড় নামে পরিচিত। এর পর তিনি সেনরাজাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কুলুর রাজাকে পরাজিত করে কুলুতে দুর্গ নির্মান করেন। মদন সেন বহু রাণাকে পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাণ্ডির উত্তর, পুর্ব ও পশ্চিমে বিভিন্ন রাণা এই ভাবে রাজ্যহারা হন। সর্বশেষে তিনি দক্ষিণ দিকে অভিযান চালান এবং সেওনি ও ও তেওনি নামে দুটি দুর্গ স্থাপন করেন। সেগুলি বর্তমান বিলাসপুরে অবস্থিত। অবশেষে তিনি একটি দৈববানী অনুসারে ‘ধর’ নামে একটি দুর্গ

নির্মান করেন। এই দুর্গটি কোন দিনই কোন শক্তির পক্ষে অবরোধ করা সম্ভব হয়নি। তার পর তিনি 'বল' এর পথ দিয়ে পাণ্ডনা প্রাসাদে আসেন। সেখানে বসবাস করে দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশাল রাজ্যের শাসনকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু সেনবংশের সহস্র স্মৃতি ও কীর্তিমণ্ডিত প্রাসাদে তিনি আত্মস্থ হতে পারছিলেন না। একদিন রাত্রে তিনি নাকি স্বপ্নে রাজ্য লক্ষ্মীর আদেশ পান যে ঐ স্থানটি তাঁর প্রাচীন পীঠস্থান এবং যদি মদন সেন সেখানে থাকেন তবে তিনি ধ্বংস প্রাপ্ত হবেন। তাই তিনি লাহোরায় তাঁর বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন—যে স্থানটি এখন মাণ্ডি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বপ্নদর্শনের পর সেই পবিত্রস্থানটিতে একটি সিংহাসনে এক দেবীমূর্তি ও সিংহাসনের পাশে অতি প্রাকৃত নিয়মে একটি তরোয়াল রাখা ছিল—এইরূপ দৃশ্য দেখেছিলেন। সেই জায়গায় তিনি একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করান। এই ভাবে স্বপ্নদর্শনের পর তিনি লাহোরায় গিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস শুরু করেন।

যুগধারার পরিবর্তন

নূতন যুগের ও মূল্যবোধের আচার সংহিতার সূচনা হল হিমাচল প্রদেশে। আয়ুর্বেদ ও শরীর বিজ্ঞানের বিধানে—খাদ্য পরিপাক যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় এবং স্মৃতির বিধান অনুযায়ী—উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইষ্টদেবতাকে স্মরণ ও নিবেদন করে নিঃশব্দে শান্তভাবে আহার্য গ্রহণ করতেন তাঁর—প্রসাদরূপে। ভোজনকালে অন্য কোন কাজে আসনত্যাগ করা অবিহিত ছিল। সে যুগে যুদ্ধও হতো যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণার পরে। তাই রাজাকে ভোজনের সময় আসন পরিত্যাগ করে বিদেশী আক্রমণকারী বা স্বদেশী বিদ্রোহীকে দমন করতে যাবার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এযাবৎ কাল। কিন্তু দেশে যখন বখতিয়ার খিলজি ইত্যাদির মত ভিন্নধর্ম ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্বের অনাদর করে শঠতা, ধূর্ত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতাকেই মূলধন করে অঘোষিত যুদ্ধ বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছেন তখন তাঁদের মোকাবিলা করার জন্য সাধারণ মানুষ পুরাতন আচার সংহিতার পরিবর্ত্তন চাইলেন—এমন একজন নেতা বা শাসক চাইলেন যিনি সনাতন বর্ণধর্ম ও কুলধর্মের আচারের নিগড়ে নিজেকে নিবদ্ধ না রেখে দেশকাল-পাত্র ও সাম্প্রতিক সমস্যার ত্বরিত অনুধাবন করে তাৎক্ষণিক সমাধানে সক্রিয় হবেন যাতে রাজ্যের স্বাধীনতা, প্রজার প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা পায়। কিন্তু রাজবংশের ও অভিজাত শ্রেণীর শাসক ও সেনাপতিরা সনাতন, মূল্যবোধ অভিজাত

আচারসংহিতা, আত্মমর্যাদা ও অস্ত্রেরপ্রতি বিশ্বাসও মর্যদাবোধ থেকে সহজে বিমুক্ত হতে না পারায় শুধু বঙ্গদেশ বা হিমাচল প্রদেশেই নয় ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা কখনও তুর্কী, পাঠান বা মোঘল কখনও বা ইউরোপীয় বণিক বা লুণ্ঠকদের হাতে পরাভূত হয়েছেন—তাঁদের জনগণ পরাধীন হয়েছেন—অত্যাচারিত-অপমানিত হয়েছেন লুন্ঠিত হয়েছেন নতুন ঔপনিবেশিক শাসক ও সেনাপতিদের হাতে। কিন্তু ইউরোপের মতো ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও কিছুকাল পূর্বে আর্থারের মতো রাজাদের এবং তাঁর গোলটেবিলের নাইটদের মধ্যে ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মতোই সনাতন মূল্যবোধ ও অভিজাত আচার সংহিতা প্রচলিত ছিল। আমরা আর্থারের যে নাইট ও সেনাপতিদের দ্বৈরথ সম্মুখ যুদ্ধের (duel) ঘোষণা করে বীরত্বের ও শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে দেখি তাঁদের নিশ্চয়ই রাত্রির অন্ধকারে—ঊষা বা সন্ধ্যার আবছা আলোয় আত্মগোপন করে শত্রুকে আচমকা আক্রমণ (Surprise attack) করে পরাস্ত করতে আত্মমর্যদাতে বাধত। আত্মগোপন (Concealment) ও ছদ্মবেশধারণের (Comouflage) রণনীতি ও গুপ্ত ঘাতকের ভূমিকা নিশ্চয়ই তাঁরা নিতে পারতেন না। তাই মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদ ঘোরী, বখতিয়ার বা আলাউদ্দিন খলজীর মতন তুর্কী বা তৈমুর—চেঙ্গিজের মতন মোঘল, ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের মতন ইংরেজ এবং পিজারো ও কোর্টেজের মতন স্পেনীয় শাসক ও সেনাপতিরা এসেছিলেন সমাজের সাধারণ শ্রেণী থেকে—যাঁদের কোন আত্মগৌরববোধ ছিলনা এবং ক্ষাত্র ধর্ম বা অভিজাত আচার সংহিতা পালনের কোন দায় ছিলনা। তাই অনায়াসেই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও সনাতন মূল্যবোধে ও বীরধর্মে বিশ্বাসী ভারতের তথা এশিয়ার, আফ্রিকার এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদি-আমেরীয়, আজটেক ও ইনকা শাসক ও সেনাপতিদিকে বিশ্বাসঘাতকতা ও ধূর্ততার সাহায্যে অন্যায় যুদ্ধে নির্মূল করতে সক্ষম হন। তাঁদের দেশ দখল করে নেন এবং শাসনের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী লুণ্ঠন ও শোষণ চালাতে থাকেন। হিমাচলপ্রদেশের প্রজাসাধারণের পক্ষে তাই সমসাময়িক যুগের উপযোগী নেতা নির্বাচন যুগোচিতই হয়েছিল এবং তাঁদের নির্বাচিত রাজাও নতুন যুগের অন্যান্য শাসকদের মত এসেছিলেন সাধারণ শ্রেণী থেকে; কোন রাজরক্তের উত্তরাধিকার তাঁর ছিলনা। কিন্তু তিনি সেন পদবী গ্রহণ করে প্রজাসাধারণের সমক্ষে যুগোপযোগী নেতৃত্বের পরিমাণ দিয়ে সেন সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাই সেন রক্তের উত্তরাধীকারী না হলেও তাঁকে সেন সংস্কৃতির ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিঃসন্দেহে

বলা যায়। কোন বিশেষ পরিবারের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে উত্তরাধিকারীর সঙ্গে পূর্বপুরুষের রক্তের (Somatic) সম্পর্ক আছে কিনা—এই প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যদিও দত্তক নেওয়ার বিধিতে তাও শিথিল হয়ে পড়েছে। পরিবারের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য, একটি রাজ্যের বা রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এমনকি বল্লালসেনের মতো কুলপতি কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের সময় কৌলীন্যের নির্ণায়ক যে নটি গুণের বিবরণ দিয়েছিলেন, যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দান—তার প্রায় সবগুলিই অর্জিত বংশগতির ; সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা অর্থাৎ Extra-Somatic। রাজ্য শাসনের জন্য রাজাদের সাধারণভাবে যুবরাজকে রাজ্যভার অর্পণ করার কথা থাকলেও—রাজ্য শাসনকার্যের জন্য রাজ-ধর্মজ্ঞান, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, নীতি—প্রয়োগের জ্ঞান, অস্ত্রশস্ত্র—প্রয়োগবিদ্যা সমর-কুশলতা, নর চরিত্রের জ্ঞান এবং প্রজা সাধারণের হিতসাধনের জন্য কর্মকুশলতা বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কুশলতা ও আর্থ—সামাজিক ন্যায় নীতি ও বিধি প্রয়োগের কুশলতা প্রয়োজন। এগুলি সবই ভাবী শাসককে সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আহরণ করতে হয়, কেননা এই গুণ ও কুশলতাগুলি অর্জনীয় (extra-somatic), বংশগতির ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই এই গুণগুলি থাকার জন্য মিঞা মদনকে সেন রাজবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যায়। এর সমর্থন পাওয়া গেছে তাঁর রাজত্বকালের যুদ্ধ জয় ও শাসনকার্যের সাফল্যের মধ্যে।

উপসংহার

সেন রাজারা ছিলেন পুরাণে বর্ণিত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশসম্ভূত। বংশতালিকা থেকে জানা যায় যে, বীরসেন থেকে শ্রীমন্ত সেন (সেবন্ত সেন বা মন্তর সেন) পর্যন্ত নিম্নলিখিত উনিশ জন রাজা যেমন—বীরসেন, ধীরসেন, বিক্রমসেন, লক্ষ্মণসেন (২য়) ধরিত্রীসেন, চন্দরসেন (চন্দ্রসেন), বিজয়সেন, সাধুসেন, রতনসেন, বিলাসসেন, সমুন্দরসেন (সমুদ্রসেন), হবন্তসেন বলবন্তসেন, শ্রীমন্তসেন (সেবন্তসেন), ও আরও পাঁচজন রাজার পর মদনসেন সুকেতের সেন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। (বংশতালিকা ও রাজ্যকাল পরিশিষ্টে দেখুন।)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দুইশতবৎসরব্যাপী এই সেন রাজাদের সুকৃতি-দুষ্কৃতি, ধর্মাধর্ম এবং উত্থান-পতনের ইতিহাস ও তাঁদের

প্রজাদের সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম, আচার-আচরণ, রাজানুগত্য, রাজদ্রোহ এমনকি রাজা নির্বাচন পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে প্রথম খণ্ডের স্বল্পপরিসরে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে দেশীয় রাজতন্ত্রেরও উচ্ছেদ হওয়ায় দেশীয় রাজাদের কেউ মদনসেনের মতো জননেতা নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়ে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, কেউবা বিষয়ান্তরে ও কর্মান্তরে আত্মনিয়োগ করেছেন। মাণ্ডির সেনবংশের বর্তমান রাজা অশোকপালসেন মনোনিবেশ করেছেন বাণিজ্যে। তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদের একাংশে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের জন্য 'কোপকবন' নামে একটি উচ্চমানের হোটেল গড়ে তুলেছেন। প্রতিদিন সকালে এই হোটেলের একটি অফিসকক্ষে বসে তিনি একজন পেশাদার আধিকারিকের (Professional Manager)—মতই পর্যটকদের সুবিধা-অসুবিধার ও হোটেলের আয়-ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। তাই রাজত্ব না থাকলেও সেনবংশে লক্ষ্মী আজও—বাঁধা কেননা লক্ষ্মী তো বাণিজ্যেই বাস করেন :

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্ধং কৃষিকর্মণি
তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

লক্ষ্মণসেনের বর্তমান উত্তরপুরুষের এই বাণিজ্যে আত্মনিয়োগটিও খুবই যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী বলে মনে হয়। আজ পৃথিবীজোড়া বেকারত্ব ও হতাশার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুপ্রাচীন রাজবংশের রাজার এই বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ আমাদের সামনে স্বনির্ভরতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

আমাদেরই এই দেশে বিদেশি ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ডকে একদিন রাজদণ্ডে পরিণত করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, জগৎশেঠ, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অর্থবান বণিকেরা আর মসলিনের মতো বস্ত্রশিল্পে, বা সোনা, রূপা, মণিমুক্তো শাঁখের অলঙ্কার শিল্পের মতো বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের শিল্পে তাঁদের মূলধন বিনিয়োগ না করে তা বিনিয়োগ করতে লাগলেন জমিদারী কেনায়। খাজনা আদায়ের জন্য ব্রিটিশের 'সূর্যাস্ত আইন' ও দেশী বণিকদের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছিল জমি কিনে রাজা-জমিদার হবার। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য ও বহির্বানিজ্য—যা অতীতে একদিন রোমসাম্রাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডার খালি করে ফেলছে বলে রোমক ঐতিহাসিকদের আশঙ্কা ও ঈর্ষ্যার উদ্রেক করেছিল—তা স্তিমিত হয়ে এল। বণিকদের পুঁজি জমিতে বিনিয়োগের ফলে ভারতবর্ষ পরিবর্তিত হয়ে গেল কেবল এক কৃষিজীবি দেশে। কিন্তু বিদেশী রাজতন্ত্রের অবসানে ও প্রজাতন্ত্রের প্রবর্তনের পর আজ আবার কোনও কোনও রাজবংশধর বাণিজ্যকে তাঁদের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করায় রাজাদের পুঁজি আবার এইভাবে হোটেল ও পর্যটন শিল্প প্রভৃতি শিল্পে বিনিয়োগের পথ পেয়েছে। বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে এক পালাবদলের সূচনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

॥ হিমাচলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবদেবী ॥

সেন সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে হিমাচলের সুকেত অঞ্চল কতগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্য গুলির কোন কোনটিতে রাজত্ব করতেন সানিয়ার্তোর মত বীর রাজপুত রানারা। আবার কয়েকটি রাজ্যের রাজা ছিলেন কানেত বংশীয় ঠাকুরেরা। এই কানেত বংশীয়দের কুনিন্দ বলা হয়। কানিংহাম এদের মহাভারতের কুনিন্দ জাতির উত্তর পুরুষ বলে মনে করেন। এই উচ্চ বর্ণের শাসকদের প্রজা সাধারনের অনেকে ছিলেন পাহাড়ী লোক যাঁরা নিম্নবর্ণের ও অনগ্রসর জাতি বলে পরিচিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন যাযাবর মেষপালকের দল যাঁরা গ্রীষ্মকালে হিমাচলের উত্তর ভাগের কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তর প্রদেশের সু-উচ্চ পার্বত্য উপত্যকায় মেষ চারন করতেন আর শীতের সময় নেমে আসতেন মাণ্ডির মত দক্ষিনের উপত্যকা অঞ্চলে। এই যাযাবর মেষ চারকের দল বিশেষ কোন রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না। কাশ্মীর, হিমাচল ও উত্তর প্রদেশের পার্বত্য উপত্যকাগুলি ছিল তাঁদের পশুচারন ক্ষেত্র। কাশ্মীরে যখন ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারিত হয় তখন সেখানকার মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে এঁরা ক্রমে ক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। এই পরিচ্ছেদের আলোচনায় তাঁদের প্রাক্ ইসলাম যুগের ধর্মমত ও দেব দেবীর কথা স্থান পেয়েছে। এই যাযাবরদের মতই উত্তর হিমালয়ের লাহাযুলি, নেপালী, ভুটানী কিছু ব্যবসাদারও শীতকালে সুকেত রাজ্যে আসতেন। এই উপত্যকায় তাঁদের পশম ও পশমী বস্ত্র, চামর এবং অন্যান্য পার্বত্য ওষধি ও ঔষধ বিক্রয় করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাল থেকে মদ্য তৈরী করে বিক্রী করতেন শীতের মরশুমে।

এই সব পাহাড়ী আদিবাসীরা বৈদিক ধর্মের অনুসরন করতেন না বা তার আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন না। প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিলেন গ্রামের নিজস্ব গ্রাম-দেবতা। গ্রামের লোকেরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ উপলক্ষে এই গ্রাম দেবতার কাছে পূজা দিতেন। এই দেবতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় কোন পাহাড়ের নামে বা, কোন পূর্বতন মুনি ঋষির নামেই আখ্যাত হতেন। তাঁদের মূর্তি অঙ্কিত থাকতো একাধিক ধাতব পাত্রে যা একটি দণ্ডের উপর থেকে নীচে পর পর যুক্ত করে সাজিয়ে মূর্তি গঠন সম্পূর্ণ করা হ'ত। এই ধাতব পাত্রগুলো অধিকাংশ-ই হয় কাংস নির্মিত। কিন্তু কিছু কিছু সোনা ও রূপার পাত্রেও দেব মূর্তি পাওয়া যায়। এই দেব মূর্তিকে একটি পালকিতে করে বহন করা হয় এবং পালকি বহনের দণ্ড দুটিকে নানান রকমের কাপড়ে সজ্জিত করা হয়। দেবতার যাত্রার সময় পুরোহিত

গায়ক-বাদক, নর্তক ও ভক্ত নরনারী সকলে নৃত্যগীত সমভিব্যাহারে মূর্তির অনুগমন করেন। এই দেবতাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খরার সময় বর্ষণ এনে দেওয়ার জন্য বিখ্যাত হন। খরার সময় রাজাও পুরোহিতের সঙ্গে দেব মন্দিরে গিয়ে বর্ষণের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান। নারায়ণ পশাকোট (পশুপতি ?) এবং চোহারের ফুগনি দেবী এই বৃষ্টি-দায়ী দেবতা নামে খ্যাত। নারায়ণ ও পাশকোট ধূম্রপান পছন্দ করেন না। তাই তাঁদের মন্দিরে তাম্রকূটের প্রবেশ নিষিদ্ধ। লাহায়ুল ও স্পিতির বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির গুলোতে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছেন লামারা। সম্ভবতঃ নারায়ণ ও 'পশাকোটের মন্দিরে ধূম পানের নিষেধাজ্ঞা এই বৌদ্ধ নিষেধাজ্ঞার-ই প্রভাব। হিন্দু পশুপতির মন্দিরে গঞ্জিকার ধূম পান বিহিত ছিল। ভক্তেরা পশুপতি মহাদেবকে ও নন্দি-ফিরিঙ্গী প্রভৃতি তাঁর অনুচর দিগকে গঞ্জিকা নিবেদন করে এবং সেই গঞ্জিকার ধূম সেবন আজও করে থাকেন। ম্রোরের গ্রাম দেবতা পরাশর নাম পেয়েছেন ঋষি পরাশরের কাছ থেকে। আষাঢ় মাসে তার বিশাল মেলা বসে। কুলু ও মাণ্ডিতে মেলা হয়, যেখানে হাজার হাজার লোক একত্রিত হন এবং কাঠের শিল্প দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের কাপড় বিক্রি হয় সেই মেলায়। সানসোর এর টিকলী দেবীর বরনাগ হলেন আর একজন প্রভাবশালী দেবতা। তাঁর মেলাতে ও বহুতীর্থ যাত্রীর সমাগম হয়। সেখানে কম্বল এবং পশম ইত্যাদি প্রচুর বিক্রি হয়। নাচন এর কামরুনাগের পাথরের মূর্তি ও খুব প্রাচীন। শোনা যায় এটি নাকি পাণ্ডবদের সমসাময়িক। এই নাগ মন্দিরটি সুকেত ও মাণ্ডির সীমানায় অবস্থিত। তাঁকে পূজা করলে মহা মারীর আক্রমন থেকে ভক্তেরা রেহাই পাবেন বলে বিশ্বাস করেন।

নাচনের শিখরী দেবী থাকেন সুউচ্চ পর্বতের শিখরে। নাগ-রক্ত তাঁর প্রিয়। তাই ভক্তেরা তাঁর উদ্দেশ্যে নাগ বলি দেন। সানরের তুঙ্গা দেবীর মন্দির অপবিত্র করলে দেবী রুষ্ট হন এবং বজ্রের দ্বারা পাপীকে বিনষ্ট করেন—এইরূপ লোক কথা প্রচলিত আছে।

ভঙ্গলে বালরু-রূপী শিবের মন্দির আছে। তিনি সর্ব রোগহর বৈদ্যনাথ। ভক্তেরা তাঁর নিকট রোগ মুক্তির জন্য পূজা ও প্রার্থনা করতে আসেন। উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাঁদের বালকদের চূড়াকরণের সংস্কার এই মন্দিরেই সম্পাদন করেন। কৃষকেরা প্রতি বৎসর মাঠ-থেকে শস্য তোলার আগে এই সব দেবতাদের উদ্দেশ্যে শস্য নিবেদন করেন। তার পর সেই শস্য তাঁরা গ্রহণ করেন।

প্রতি বৎসর ১৬-ই ভাদ্র, রাত্রে সব দেবতারা একত্রিত হন মাণ্ডি রাজ্যে

ধরকণ্ডো গিরিতে। সেখানে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চার দিক থেকে চার যোগিনীও আসেন এবং তাঁদেব সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সেই যুদ্ধ চলতে থাকে যতক্ষণ না এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় নির্ধারিত হয়। যে বৎসর দেবতারা জয়লাভ করেন সে বৎসর দেশ শস্য সম্পদে ভরে যায়। আর যে বৎসর যোগিনীরা জয় লাভ করেন সে বৎসর আসে দুর্ভিক্ষ। ধরকণ্ডো গিরির গো-মহিষ চারকেরা ওই দেবতা ও যোগিনীদের যুদ্ধের তিথি শুরু হওয়ার আগেই তাদের স্ত্রীরা মহিষদের ধরকণ্ডো-গিরির থেকে নামিয়ে আনেন যাতে যোগিনীরা তাদের মেরে ফেলতে না পারেন। ১৬-ই ভাদ্রের রাত্রে হিন্দুরা পরস্পরের মধ্যে সর্ষে আদান প্রদান করেন। যা দিয়ে যোগিনীদের অনিষ্টকারী প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। লাড্ এর নক্লোল মহাদেব-এর মন্দিরে অসংখ্য অকৃত্রিম সহজাত শিব মূর্তি আছে। শোনা যায় একজন মেষ পালক গদ্দি তাঁর কাছে অপরাধ করায় তিনি রুষ্ট হয়ে তাদেরকে পাথরে পরিণত করেদেন। অনন্ত পুরের নবাহীদেবীর মন্দির। সেখানেও ৫ই বৈশাখ বিশাল মেলা বসে। সেখানে মাণ্ডি ও হামির পুর তহশীল থেকে হাজার হাজার লোক এসে জমায়েত হন। এই মন্দিরেও সুপ্রাচীন কালের অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। লিণ্ডি ধর পাহাড়ে বারতাদেব নামক স্থানে ২-রা শ্রাবন একটি মেলা বসে এই গ্রাম দেবতার উদ্দেশ্যে। ইনি নাকি স্ত্রী মহিষের বন্ধ্যাত্ব নিরাকরণ করে থাকেন।

রাজপুত ও কাণেত প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকেরা ও এইসব পর্বত ও গ্রাম দেবতার পূজায় অংশ নিলেও তাঁরা প্রকৃত পূজা করেন পৌরানিক দেব দেবীদের। দেবতাদের মধ্যে প্রধান উপাস্য হলেন শিব, বিষ্ণু সূর্য এবং গণেশ। আর দেবীদের মধ্যে প্রধান উপাস্যা হলেন শ্রীবিদ্যা, দুর্গা, বগলামুখী বালা, কালী ও তারা। এই উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাঁদের পুত্রদের শৈশবেই গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে সূর্য উপাসনা শেখাতেন তাঁদের কুল পুরোহিতদের দ্বারা। একে বলাহত উপনয়ন সংস্কার। এই মন্ত্র অনুচ্চস্বরে শেখান হত যাতে তা অন্যবর্ণের শ্রুতিগোচর না হয়। উপনয়নের পরে উপাস্য দেবদেবীদের মধ্যে থেকে ইষ্ট দেবতা নির্বাচন করা হত দীক্ষার সময়—যাঁর বিশেষ রূপে উপাসনা শুরু করতেন দীক্ষিত বালক-ব্রহ্মচারীরা। সূর্য গ্রহণের দিনকে-এইরূপ উপবাস দীক্ষাগ্রহণ এবং বেদপাঠ ইত্যাদি শুরু করার পক্ষে প্রশস্ত মনে করা হত। পূজা—বেদীর

কেন্দ্রস্থলে ইষ্টদেব অথবা দেবীকে স্থাপন করে তাঁর পাশে অন্যদেব দেবীকে পার্শ্ব দেবতারূপে স্থাপন করা হত।

হিন্দু পূজা বিধি—হিন্দু পূজার্চনা করা হ'ত দুইপ্রকার রীতি ও পদ্ধতিতে। এই রীতি পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য হিন্দুদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—যেমন, বামাচারী ও দক্ষিণাচারী সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রিয়ের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষিণাচারী। তাঁদের সাত্ত্বিক ও বলা হত। তাঁরা দেবীকে কখনও আসব নিবেদন করতেন না এবং বামাচারীদের উশৃঙ্খল আচার আচরণ ও রীতিরেওয়াজ তাঁরা সমর্থন করতেন না। অন্য দিকে বামাচারীরা তাঁদের চক্রে মিলিত হয়ে তাঁদের গুহ্য-সাধনতন্ত্রের অনুশীলন করতেন ও অবাধে পানাহার করতেন।

সম্ভবতঃ হিমালয়ের পার্বত্য দেবতাদেরই মধ্যে একজন কৈলাসের অধিষ্ঠিত দেবতা তাঁর অনুচর নন্দী ভৃঙ্গীদের নিয়ে বৈদিক দেবমণ্ডলীতে প্রবেশ করেন এবং ভক্তদের পূজায় স্থান করে নেন। পুরাণে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি কাহিনীর মধ্যে বৈদিক হিন্দুদের শিব-পূজাকে প্রতিরোধ এবং সেই প্রতিরোধের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ার ইতিহাস বিধৃত আছে। বৈদিক হিন্দু-তনয়াদের অবৈদিক পাহাড়ী যুবকদের সঙ্গে বিবাহের ফলেই ঐদুহিতারা পাহাড়ী দেবতাদের পূজা নিয়ে আসেন তাঁদের পিতৃকূলের যজ্ঞ মণ্ডপে। সম্ভবতঃ শিব-প্রথমে লিঙ্গ রূপী-দেবতা রূপেই পূজিত হতেন। মেক্সিকোর মায়াভাষায় 'শিব' কথাটির মানেই হ'ল 'লিঙ্গ'। মায়াদের দেশে উস্মাল (Uxmal) প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানের প্রাচীন মায়াযুগের শিবলিঙ্গ অবহেলিত অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এই শিব লিঙ্গ যোনিপট্টবিহীন। পুরাণে দেখা যায় দেবতাদের মত - তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ময় ও অন্যান্য অসুরেরা শিবের খুব প্রিয় ছিলেন। বৈদিক হিন্দুরা শিশ্ন পূজক ছিলেন না। তাঁরা সম্ভবতঃ এই অসুর ও দানবদের আধিপত্যের সময় এই—লিঙ্গ দেবতাকে তাঁদের দেবমণ্ডলীতে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আসামের তেজপুরের শিবলিঙ্গও শিব মন্দিরটি নাকি-বাণাসুরের দ্বারা স্থাপিত। তিনি যখন সেখানে যান তখন তিনি তাঁর কুলদেবতা শিবকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। নরকাসুর অসুরদের কুলদেবতা শিবের পরিবর্তে যোনি রূপিনী-দেবী কামাখ্যার আরাধানা শুরু করেছিলেন তাঁর দানব প্রজাদের প্রভাবে। কিন্তু বাণাসুরের শিব মন্দির—স্থাপনের পরে তিনি অসুর কুলদেবতা শিব পূজার দিকে ঝুঁকে পড়েন ও ফলে তাঁর দানব প্রজাদের সহানুভূতি ও সমর্থন হারান ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। এই সব কাহিনী থেকে মনে হয় অসুরদের লিঙ্গদেবতা স্থানীয়

লোকেদের পর্বত দেবতা ও বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হয়ে শিব মহাদেব রূপে হিন্দু দেব মণ্ডলীতে পরিচিত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে লেখকের cultural History of Bhutan এ প্রথম খণ্ডে।

হিমাচল প্রদেশে শিব শুধু লিঙ্গ রূপেই নন তিনি নানা রূপে পূজিত। বিপাশা নদীর দক্ষিণ কূলে তিনি পঞ্চবক্ত্র শিব এবং ত্রিলোকনাথ নামে প্রসিদ্ধ তাঁর মন্দিরের ডান পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিপাসা নদী।—

মাণ্ডির সংখেতর স্ট্রীটে আছে অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্তি।

মাণ্ডির ভূতনাথের মন্দিরটি খুব প্রাচীন এই শিব মন্দিরের জন্য রাজা বিজয়সেন সোনা ও রূপা দিয়ে একটি ফটক লক্ষ্ণৌ থেকে বানিয়ে এনে এই মন্দিরের তোরণে স্থাপন করেন। ভূতনাথের প্রকট হওয়া সম্বন্ধেও যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে শিব লিঙ্গের আত্মপ্রকাশের কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিপাসার বামকূলে ছিল বিশাল গোচারণের ভূমি যেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামের গরু চরত। রাজা আজবর সেন শুনলেন একটি গাভী সেই চারণ ভূমির একটি পাথরে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাদ দুগ্ধ দান করে। রাত্রে তাঁর মনে হল স্বপ্নে তিনি সেই জায়গাটি খনন করার জন্য শিবের আদেশ পেয়েছেন। সেই আদেশানুসারে সেখানকার মাটি খুঁড়ে যে মূর্তিটি পেলেন সেটিই এখন ভূতনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে পূজিত হচ্ছেন। বালকনাথকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মনে করা হয়। বিপাশা নদীর তীরে তাঁর একটা মন্দির আছে। ভঙ্গলের বালকরূপী শিবের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শিবগোষ্ঠীর সকল দেবতাই লৌকিক দেবতা থেকে বৈদিক হিন্দুদেবমণ্ডলিতে গৃহীত হয়েছেন। পরবর্তী কালের গণপতি হলেন আরো একজন শিবগোষ্ঠীর দেবতা। শিব ওপার্বতীর তনয় তিনি। গজমুণ্ড এবং মূষিক বাহণ। তাঁর চারিটি হাত যাতে তিনি শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। অন্যান্য শিবগোত্রীয় দেবতার তুলনায় হিন্দু দেবমণ্ডলীতে তিনি অনেক এগিয়ে আছেন কেননা যে কোন দেব-দেবীর পূজার প্রারম্ভেই গণেশের পূজা আবশ্যিক ভাবেই করা বিধেয়। ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে ঘরের দরজায় গণেশের মূর্তি অঙ্কিত থাকলে বিঘ্ন ও বিপদ ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

কিছু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেউ কেউ আবার শিবানুচর ভৈরবের পূজা করেন। ভৈরবের মূর্তি একখণ্ড কাগজে অঙ্কিত করেন। মাণ্ডিতে একটি বড় পুকুরের পাড়ে ভৈরবের একটি মন্দির আছে তার নাম সিধ্ ভৈরব

(সিদ্ধ ভৈরব)। তাঁর কাছে দিনে চারবার প্রার্থনা অনুষ্ঠান হয় প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে, সূর্য্যাস্তের সময় ও মধ্য রাত্রিতে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মাণ্ডি শহরে যে উনপঞ্চাশটি পূজা অর্চনার স্থান ছিল —তার মধ্যে চুয়াল্লিশটি ছিল প্রকৃত পক্ষে মন্দির এবং তাদের মধ্যে চব্বিশটি ছিল শিব মন্দির। মাণ্ডির গোঁসাইরা ছিলেন শিব ভক্ত শৈব। তাঁদের পরিবারে কারো মৃত্যু হলে মৃতদেহকে উপবেশনের ভঙ্গিতে বসিয়ে তার উপরে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হতো সেই স্তূপের শিখর ছিল কৌনিক আকৃতির। গোঁসাইদের পুরোহিতদের বলা হতো মহান্ত। তাঁরা বিয়ে-সাধি করতেন না তাঁরা পৌরহিত্য করতেন শিষ্য পরম্পরায় তাঁদের মন্দিরের নাম ছিল মঠ। তাই বাংলার কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব গোস্বামীদের সঙ্গে হিমাচলের গোঁসাইদের মিলিয়ে ফেললে ভুল হবে। হিমাচলের গোসাইরা শৈব। সম্ভবতঃ প্রাচীন কালে এঁরা সেনরা (gsen-rap) প্রবর্তিত বন্ (Bon) ধর্মের অনুসারী ছিলেন—যে ধর্মে প্রধান দেবতা ছিলেন সদাশিব (Kuntu Zngpo) গোঁসাই নামটি ও সম্ভবতঃ গোস্বামী শব্দের তদ্ভব রূপ মনে হলেও এতে (Gsen) জ্ঞান কথাটির প্রভাব আছে কি না এবিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। আমরা পূর্বে দেখেছি স্পিতিতে একটি সেন বংশ রাজত্ব করতেন—বঙ্গ থেকে সেন বংশীয় রাজাদের সুকেতে আসার কয়েক শতাব্দীর পূর্বে। এই সেন রাজাদের সঙ্গে বঙ্গ কর্ণাটকের সেন রাজাদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাও নতুন গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কেননা সেন বংশের কুল দেবতাও হলেন সদাশিব। শিবক্ষেত্র হিমাচলে বিষ্ণুর পূজা পদ্ধতি এসেছিল বন প্রভৃতি শৈব ধর্মের পরে। সম্ভবতঃ শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য স্থাপিত হয়েছিল হরি ও হরের অর্ধ নারীশ্বর মূর্তি। মাণ্ডির সঙ্গীতর-স্ট্রীটে অর্ধ-নারীশ্বরের মন্দিরটি অবস্থিত। মোহিনী রূপী হরের এই যুগ্ম মূর্তিটিকে শৈবেরা এবং বৈষ্ণবেরা প্রত্যেকেই আপন আপন দেবতা বলে পূজা করতেন। আরও তিনটি বৈষ্ণব মন্দির আছে। একটি হলো রামচন্দ্রের অন্যটি জগন্নাথের। তৃতীয়টি মাণ্ডি থেকে দুমাইল উপরে কৃপাবনীতে। যোগী ও নাথ সম্প্রদায়ের সাধকেরা কেবল গুগা-র পূজা করেন। সাবৎ ও পাশানীয়ার কয়েকজন রাজপুত মিলে গুগা-র মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যাতে গুরু গোরখ নাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, ভৈরম (ভৈরব) নরসিংহ, কইলু, হনুমান, শিরখণ (শ্রীখণ্ড), কলতা, গুগরি প্রভৃতির পাথরের মূর্তি স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের খুব কম লোক-ই এই ধর্ম মতের অনুসরণ করেন কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুরা গুরু গোরখ নাথের শিষ্য এবং তাঁর শিষ্যদের

পূজা করে থাকেন। কমলা অঞ্চলে বালকরূপীতে এই সং শিবদের একটি বড় মন্দির আছে। তাছাড়া হাটলিতে ও একটি ছোটো শিব মন্দির অবস্থিত। কত্রিয় নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সব মন্দিরে আসেন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করতেন।

বৃক্ষ পূজা—বর্ণ নির্বিশেষে সব হিন্দুই অশ্বথ বৃক্ষকে শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করে থাকেন। এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠাকে একটি পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান বলে মনে করেন। অপেক্ষা কৃত ধনী লোকেরা অশ্বথ গাছের চারিদিকে বেদী বাঁধিয়ে দিয়ে পথক্লান্ত পথিকদের জন্য ছায়া পূর্ণ বিশ্রামস্থল নির্মাণ করা পুণ্য জনক সমাজ সেবার কাজ মনে করেন। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের ঘরে তুলসি মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে মেয়েরা তুলসি তলায় প্রদীপ দিয়ে পূজা করে থাকেন।

উপাস্যা দেবী—মেয়েদের বিয়ের সময় তাদের পিতা-মাতা মেয়েকে যে গৌরীমূর্তিটি দান করেন বিবাহের পরে মেয়েরা সেই গৌরী মূর্তিকে পূজা করে থাকেন। হিমাচলের উপাস্যাদেবীদের মধ্যে একজন হলেন শ্রী-বিদ্যা তাঁকে রাজেশ্বরী ও বলা হয় তিনি রক্তাম্বরা, ভূষিতা ও চতুর্ভুজা তাঁর একহাতে পাশ (মানুষের মাথার খুলি) অপর এক হাতে অঙ্কুশ অন্য দুই হাতে তীর ধনুক তাঁর কপালে অর্দ্ধ চন্দ্র শোভা পাচ্ছে তিনি ঐশ্বর্য ও সুখ দায়িনী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিব পর্যন্ত তাঁর পালঙ্ক বহন করেন। তিনি মণিদ্বীপ, স্বর্গ বাসিনী। সেন রাজাদের প্রাসাদে এই দেবীর মন্দির আছে। মাণ্ডির প্রাচীন রাজারা ছিলেন এই দেবীর ভক্তদের মধ্যে প্রধান। রাজেশ্বরী নামটি থেকে তাঁকে সেন রাজাদের রাজ্যলক্ষ্মী বলেই মনে হয়। এই দেবীর মূর্তি কলা ও পূজা পদ্ধতি নিয়ে অনুসন্ধান করলে আমরা হয়ত বঙ্গদেশে ও কর্ণাটকের সেন রাজ দেবালয়ে অনুরূপ দেবী মূর্তি ও তাঁর পূজা পদ্ধতির সন্ধান পেতে পারি। **বালাদেবী** ও হলেন চতুর্ভুজা তাঁর একহাতে বেদ অন্য হাতে রুদ্রাক্ষের মালা তৃতীয় হাতে করতল প্রসারিত দানমুদ্রা যা সূচনা করেছেন ভক্তদের মনবাঞ্ছা পূরণ। তাঁর চতুর্থ হাতে করতলে বরাভয় মুদ্রা যা দিয়ে ভক্তদের তিনি সর্ব প্রকার অভয় দান করছেন।

বগলাদেবী মূর্তি—দেবীর মূর্তিতে তাঁর মুখটি বকের মতন বলে তিনি এই নাম পেয়েছেন। তিনি পীতাম্বরা। তাঁর এক হাতে গদা এবং অন্য হাতে দৈত্যের জিহ্বা ধরে আছেন। রাজপুরহিতেরা এই দেবীর পূজা করে থাকেন। এই দেবীর মূর্তিকলা ও পূজা পদ্ধতি অনুসন্ধানে সেন রাজ পুরোহিত বংশের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। এই দেবীর মূর্তি সম্ভবতঃ নদী, খাল বিল বহুল

এবং মৎস্যাসী বক ইত্যাদি পাখিতে পরিপূর্ণ বঙ্গ দেশ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে এবং সেখান থেকে সেন রাজাদের বাঙালী রাজ পুরোহিতেরা হয়ত দেবীকে হিমাচল প্রদেশে এনে ছিলেন তাঁদের কুল দেবীরূপে।

দুর্গা (ও ভবানী)—নবরাত্রির সময় সর্ব বর্ণের হিন্দুদের তিনি পূজা পান আশ্বিন মাসে তাঁর মূর্তি বঙ্গদেশের সিংহবাহিনী দুর্গার অনুরূপ এবং তাঁর পূজা চণ্ডীপাঠ সহকারে দেবী পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রাক্তন হিমাচল বাসীরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত বামাচারী ও দক্ষিণা চারী।

তারা—তারা হলেন চতুর্ভুজা দেবী। তাঁর মস্তকে জটার সর্পের ভূষণ, হাতে তাঁর পদ্ম, নরকঙ্কাল, অসি ও খেটক। হিমাচল প্রদেশের তারার মূর্তি ও পূজা পদ্ধতি নিয়ে এসে ছিলেন সম্ভবতঃ সুকেতের বৌদ্ধ গুরু পদ্ম সম্ভবের শিষ্য ও রিবাল সরের বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীরা। হিন্দুরা তারাকে গৌরী-পার্বতীর দশ মহা বিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা বলে মনে করেন। শিব শক্তি সংগমতন্ত্র বলেন যে কেবল চীনাচার-ক্রমে তারাকে পূজা করে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এই মহা চীনাচারে আবার দুইটি ধারা—সকল ও নিষ্কল। সকল ধারাতে স্নানাদির শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না (কিংবা স্নানম্ কস্তবা স্নানম্) এটি অনুসরণ করেন বৌদ্ধরা। হিন্দুরা অনুসরণ করেন নিষ্কল ধারাটির যেখানে প্রয়োজন স্নানাদির শুদ্ধির। তারাকে ভারত বর্ষে প্রথমে নিয়ে আসেন ঋষি বশিষ্ঠ। উত্তরে মহাচীন থেকে। তন্ত্রে এই দেবী তারাকে বলা হয়েছে উগ্রতারা। বশিষ্ঠের মহাচীনে গিয়ে তারা সাধনার শিক্ষা গ্রহণের কথা জানা যায়। কথিত আছে ঋষি বশিষ্ঠ বৈদিক আচার অনুযায়ী অনেক তপস্যা করেও দেবীর সাক্ষাৎ না পেয়ে তাঁকে শাপ দেন তখন দেবী অবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলেন যে তিনি যে আচার ক্রমে সাধনা করছেন তা ভুল পথ। তাঁর ধ্যান ও পূজা পদ্ধতি বেদে অপরিজ্ঞাত। কিন্তু মহাচীনে এই সাধনক্রম সুপরিজ্ঞাত। সেখানে বৌদ্ধদের মধ্যে এই সাধন পদ্ধতির বহু প্রচলন আছে। বশিষ্ঠ সেখানে গিয়ে সাধনক্রম শিখে সাধন করলে বশিষ্ঠের মনবাঞ্ছা পূরণ হবে।

তত্রগত্বা মহাভাবং বিলোক্য মৎপদাম্বুজম্
মৎকুলজ্ঞো মহর্ষেত্বম্ মহাসিদ্ধোভবিষ্যসি॥

রুদ্রযামল-পটল—১৭ (জীবানন্দাবিদ্যা সাগরের সংস্করণ) পৃ ১৫২।

বশিষ্ঠ তখন মহাচীনে অর্থাৎ তিব্বতে গেলেন তারার সাধনা পদ্ধতি শিখতে, যে দেশকে দেবী বৌদ্ধদের ও অথর্ব বেদের রাজ্য ব'লে বর্ণনা করেছিলেন

('বৌদ্ধ দেশে' খর্ব বেদে মহাচীনে সদাব্রজ '১২২)। সেই বৌদ্ধ দেশে উপনীত হয়ে তিনি দেখলেন সেখানকার বুদ্ধ নরনারীর সঙ্গে মৈথুনে, মদ্য—মাংস সেবনে রত। তিনি অবাক্ হয়ে বুদ্ধকে এই বেদবিগর্হিত অসংযত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন—তন্নাশয় মম ক্ষিপ্রং দুর্বুদ্ধিং বেদ গামিনীম্

বেদ বহিষ্কৃতং কর্ম সদাতে চালয়ে প্রভো। ১২৯
কথমেতৎ প্রকারঞ্চ? মদ্যং মাংসং তথাঙ্গনাম্
সর্বে দিগম্বরাঃ সিদ্ধা রক্ত পানোদ্ধতা বরাঃ। ১৩০
মুহুর্মুহুঃ প্রপিবন্তি রময়ন্তি বরাঙ্গনাম্
সদা মাংসাসবৈঃ পূর্ণামত্তা রক্তবিলোচনাঃ। ১৩১

—রুদ্র যামলঃ

বুদ্ধ বশিষ্ঠকে বোঝালেন যে স্বয়ং শিব ও শক্তিকে ছাড়া নির্বল ও বলহীন তাই সাধারণ অজ্ঞ মানুষের তো কথাই নেই—তাই তাদের ভিন্ন লিঙ্গের সঙ্গে রতি মৈথুনে দোষারোপ করা উচিত নয়।

—শক্তিং বিনা শিব বো' শক্তঃ কিমন্যে জড় বুদ্ধয়ঃ। ১৫৭—রুদ্রযামলঃ) একথা বুঝিয়ে বুদ্ধ বশিষ্ঠকে পঞ্চমকার সাধনার রহস্যে দীক্ষিত করলেন। বশিষ্ঠ মহাচীনে মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মৈথুন সাধনে রত হয়ে আধ্যাত্মিক সাফল্য লাভ করলেন। রুদ্রযামলের এই কাহিনী সমর্থন করে যোগিনী তন্ত্র আরও যোগ করেছেন যে বশিষ্ঠ মহাচীন থেকে ফিরে আসামের নীলাচলে অর্থাৎ কামাখ্যায় তারার সাধনা শুরু করেন॥

ব্রহ্মণঃ মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠ' তীব সদযতিঃ
তারামারাধয়ামাস তদা নীলাচলে মুনিঃ। যোগিনীতন্ত্রম্ ১।১২।১৫

কামরূপের কামাখ্যা পাহাড়ে দেবীর যোনিমূর্ত্তি অবস্থিত। কামাখ্যা দেবীর প্রণাম মন্ত্রেও নীলপর্বতে তাঁর যোনিরূপে অবস্থানের তথ্যটি উল্লিখিত হয়েছে।

কামাখ্যা বরদে দেবী নীলপর্বত বাসিনী
ত্বংহি জগন্মাতা যোনি মুদ্রায়ৈ নমোস্তুতে॥

পলিনেশিয়ার মাওরী প্রভৃতি দানব ভাষায় 'তারা' মানে হ'ল—'যোনি'। ইন্দোনেশিয়ায় নাবিকেরা তারাকে বলেন 'কাণ্ডজেঙ রাতু কিদুল' অর্থাৎ দক্ষিণের (সমুদ্রের) মহারানী যিনি নাবিকদের সমস্ত তুফান থেকে ত্রাণ করেন।

মহাযান বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্ভবতঃ ইন্দোনেশিয়ার বরোবুদুর থেকে এই তারা সাধনার ধারাটিকে তিব্বতে নিয়ে আসেন। এই যোনি সাধনার ধারাটিও খুব সম্ভবতঃ পূর্ব সমুদ্র থেকে তিব্বত ঘুরে এসেছিল কামাখ্যায়। তারপর কামাখ্যা ও বঙ্গের সিদ্ধাচার্যদের নবম দশম শতাব্দীতে রিবালসরে তীর্থযাত্রার সময় তাঁদের হিমাচলী শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই তারা সাধনা ও উপাসনার পদ্ধতি এবং ক্রমে তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মেও প্রবেশ করে। দেবী তারার সাধনা পলিনেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ঘুরে যেমন ভারতবর্ষে পৌঁছেছিল উত্তরের হিমালয় থেকে—তেমনি আবার কালীসাধনার ধারাটি এসেছিল পেরুদেশ থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ সমুদ্র বেয়ে বঙ্গ উপসাগরের কূলে। সেখান থেকে কবে কেমন করে দেবী কালিকার মূর্তিকল্প হিমাচলে পৌঁছাল সে বিষয়টি আলোচিত হ'ল পরবর্তী পরিচ্ছেদে ॥

।। দেবী কালিকার মূর্ত্তিকলার উদ্ভব ও দেশান্তর ও যুগান্তরে তার রূপান্তর ।।

"কালিকা বঙ্গদেশে চ"—আদ্যাস্তোত্রের এই নির্দেশ অনুযায়ী কালিকার উদ্ভব স্থল অনুসন্ধান করতে হয় বঙ্গ দেশে। কিন্তু এই 'বঙ্গ' শব্দটির অর্থ কি? এই প্রশ্নের সমাধানে কালিকার প্রাচীনতম পীঠেরও[1] সন্ধান পাওয়া যাবে। পলিনেশিয়ার নাগ (অষ্ট্রোনেশিয়ান) ভাষায় যথা মাওরী ভাষায় বঙ্গ বা হুঙ্গ (whanga) কথাটির অর্থ হল উপসাগর।[1] এই উপসাগর বঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি দেশের তটভূমিকে বিধৌত করে এবং এই দেশ গুলিকে জলপথে সংযুক্ত করেছে সমুদ্রপারের অন্যান্য নাগাসুর অধ্যুসিত দ্বীপ ও দেশ গুলির সঙ্গে। এই উপসাগর দিয়েই এখানে পূর্ব দক্ষিণ সমুদ্র বেয়ে পৃথ্বীমাতার মূর্তি ও পূজা পদ্ধতি এসে পৌঁছেছিল সুদূর পাতাল দেশের পেরু থেকে। কলিঙ্গের অধিবাসীরা প্রাচীন কালথেকে সমুদ্র পারের বিভিন্ন দূর দেশে বাণিজ্য যাত্রা করতেন এর কিছু নিদর্শন আজও প্রত্যক্ষ করা যায়– উড়িষ্যার 'বালিযাত্রা' ব্রত পার্বনে সমুদ্রগামী বণিক ও নাবিকদের বধূরা ঐ ব্রত পার্বনে মহানদীতে প্রদীপ ভাসিয়ে দিতেন, বালি দ্বীপের যাত্রী তাঁদের স্বামীদের মঙ্গল কামনা করে। বালি দ্বীপের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য হ্রাস পেলেও উড়িষ্যার বধূরা আজও জলে প্রদীপ ভাসিয়ে দেন। সেই প্রদীপের আলোয় আমরা খুঁজে পাই পুরানো দিনের ইতিহাসকে। বালিদ্বীপ তথা ইন্দোনেশিয়া হল তারা সাধনার পীঠস্থান। সমুদ্রের রানী 'তারা' যিনি নাবিকদের সহস্র বিপদ তারিনী তাঁকে ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল নাবিকই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন 'কুঞ্জেঞ রাতু কিদুল' (দক্ষিণের মহারানী) নামে। মহর্ষি অগস্ত্য এখানে শ্রীযন্ত্র ও শক্তি সাধনার প্রবর্ত্তন করে ছিলেন বলে শোনা যায়। মার্কণ্ডেয় ঋষিরও শক্তি সাধনার একটি ক্ষেত্র ছিল বালি দ্বীপ। সেখানে বেশাখিতে ঋষি মার্কণ্ডেয়-র সমাধিস্থল আছে। একথা বিশ্বাস করেন বালি দ্বীপের অধিবাসীরা। পলিনেশিয়ার কিরিবাটি দ্বীপে 'তারাবা' (Tarawa) নামে একটি সু-প্রাচীন নগর অবস্থিত যেটি শ্রীলঙ্কা থেকে ৯০° পূর্বে অবস্থিত এবং প্রাচীনকালে "যমকোটিপুর" নামে পরিচিত ছিল সেটি ও

হয়তো 'তারা' সাধনার একটি যোনি পীঠ ছিল বলে মনে হয়।* 'তারা' (Tara)* এই শব্দটির মাওরী প্রভৃতি পলিনেশিয়ান ভাষায় অর্থ হল 'যোনি', 'শক্তি' ইত্যাদি। পূর্ব ভারতে মণিপুরে এবং আসামে কামাখ্যা মন্দিরে যে যোনি পীঠ দেখা যায় সেখানে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি পলিনেশিয়ান নানান দেবদেবীর আরাধনা করা হত বলে অনুমান করা হয়। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা বঙ্গ তটভূমির ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজটি সীমাবদ্ধ রেখেছেন ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই। তাই দেশান্তর থেকে আগত দেবদেবী ও তাঁদের মূর্ত্তিকলা সম্বন্ধে তাঁরা খোঁজ রাখেন না।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরে যে 'মাদলা পঞ্জিকা' সংরক্ষিত আছে তাতে জানা যায় খৃষ্ট জন্মের প্রায় তিনশত বছর আগে উড়িষ্যায় যে যবন (Ionian) বা গ্রীক আক্রমণ হয়েছিল খৃষ্টীয় চব্বিশ অব্দে তাদের শেষ আক্রমণ সংঘটিত হয়। এই আক্রমণ-কারী যবনেরা ১৪৬ বৎসর কাল কলিঙ্গে অপ্রতিহত ভাবে রাজত্ব করেন। ভারতে আগত গ্রীকেরা অনেকেই হিন্দু ধর্মের সমর্থক ছিলেন।

মৌর্যসম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকেও সেখানকার লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম ও তার পরিণতিতে দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে দিয়ে সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব ও প্রভাব বিস্তারের কথা জানা যায়। এই প্রভাব অশোকের সময় থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময় ভারত মহাসাগরের শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ গুলিতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য ও স্তূপ ও বিহার নির্মানের জন্য কলিঙ্গ থেকে ধর্মপ্রচারক, ভিক্ষু ও স্থপতিরা এই সব দেশে যাতায়াত করতেন। শ্যাম দেশে কলিঙ্গের দন্ত রাজ্যের দন্ত রাজকুমার ও রাজকুমারীর পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি-নাখোন্ সিথম্মরাট (নগরশ্রী ধর্মরাজ) এর মহাবিহারের পুরোভাগেই সযত্নে রক্ষিত আছে। কেননা তাঁরা ভগবান বুদ্ধের পঞ্জরাস্থি নিয়ে গিয়ে ঐ মহাবিহারের স্তূপটি নির্মান করেন। তাই ভক্তেরা স্তূপে বুদ্ধের অর্চনার জন্য প্রবেশের পূর্বে দন্তরাজকুমার ও দন্তরাজকুমারীকে আজও পুষ্প মাল্য ও ধূপ-দীপ দিয়ে অর্চনা করে যান। কলিঙ্গের বৌদ্ধেরা যেমন শ্যামদেশের নাখোন্ সি-থম্মরাট ইত্যাদি এবং যবদ্বীপের বোর বুদুর প্রভৃতি বৌদ্ধ-স্তূপ ও বিহারে যাতায়াত করতেন তেমনি সেসব দেশের বণিক ও বৌদ্ধ তীর্থ যাত্রীরা এবং সিংহলের

---

2. * Ibid, Page-55

বৌদ্ধরাও ভারত বর্ষের বৌদ্ধ তীর্থ দর্শনে এসে প্রথমে চরিত্র-নগরের সমুদ্রকূলে জাহাজ থেকে নামতেন। এই প্রাচীন চরিত্র-নগরই হল আজকের পুরী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। বৌদ্ধযুগে এখানে বুদ্ধদেবের দন্ত সমন্বিত স্তূপ ছিল। নগরের বাইরে পাঁচটি ধর্মশালা ছিল। বিদেশী তীর্থ যাত্রীরা সেগুলিতে আশ্রয় নিয়ে বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহের নিদর্শন দেখতেন এবং উদয় গিরি ও খণ্ডগিরির বৌদ্ধ কীর্ত্তি গুলিও দেখে সেখানকার শ্রমণদের ধর্মোপদেশ শুনে তারপর রওনা হতেন পুণ্যভূমি মগধের উদ্দেশ্যে।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বা নবম শতাব্দীর গোড়ায় কলিঙ্গে কেশরীবংশের অভ্যুদয় হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমাবসান শুরু হয়। তাঁদের রাজধানী ভুবনেশ্বরে বিশাল শিব মন্দির নির্মিত হয় এবং মূল মন্দিরটির চতুর্দিকে আরও সাতশত শিব মন্দির নির্মিত হয়েছিল যার মধ্যে কয়েকশত এখনও বিদ্যমান আছে।

কেশরী বংশের রাজধানী ভুবনেশ্বর যেমন শিব ক্ষেত্র তেমনি তাঁদের দ্বিতীয় রাজধানী যাজপুর ছিল শিবানী ক্ষেত্র। সেখানেও দেবীর বিশাল ধ্বংসকারিনী মূর্তি পূজিত হয়ে আসছে। মহিষাসনা, বারাহী, চামুণ্ডা, চতুর্ভুজা গজাসনা ঐন্দ্রী, ময়ূর বাহিনী, কৌমারী, পদ্মাসনা মহালক্ষ্মী প্রভৃতি নানা দেবীর প্রস্তর মূর্তি পূজিত হত যাজপুরে। কিন্তু অনেক মন্দির ও মূর্তি মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। তার মধ্যে কিছু স্থান পেয়েছে মিউজিয়ামে। সমসাময়িক বারোবুদুরের পাশে শুরু হয় পরমবাননের হিন্দু মন্দির মালা। সেখানে মহিষ মর্দিনী দুর্গার সুন্দর মূর্ত্তি গড়ে ছিলেন বঙ্গোপসাগরের কূলের রূপ দক্ষ ভাস্করেরা—যাঁকে স্থানীয় নাগজাতির অধিবাসীরা তাঁদের রাজকুমারী লোরো জোঙ্‌রাং-এর প্রতিমূর্তি বলে মনে করেন। মহিষ মর্দিনী দুর্গা যেমন যবদ্বীপে গিয়ে লোরো জোঙরাং রূপে সেখান কার রূপ কথায় সাঙ্গীকৃত হয়েছেন, তেমনি লোলজিহ্বা কৃষ্ণাঙ্গী, গলমুণ্ড মালিনী পৃথ্বী-মাতাও সম্ভবতঃ পাতাল দেশের পেরু থেকে দক্ষিণ সমুদ্র বেয়ে পথে এসে কালিকারূপে পূজা পাচ্ছেন কলিঙ্গের উপকূলে। পেরুর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মৃৎ পাত্রে যে পৃথ্বী মাতার মূর্তি পাওয়া যায় তা অবিকল কৃষ্ণাঙ্গী, আয়তাক্ষী লোল জিহ্বা কালিকার মূর্তির মতই। শেষাংশে পৃথ্বী মাতা ও কালিকার দুটি ছবি পাঠকেরা যাতে তুলনা করতে পারেন সে জন্য দেওয়া হল।

'বঙ্গ' শব্দটি এসেছে পলিনেশীয় ভাষা থেকে

আমরা দেখেছি 'বঙ্গ' কথাটির নাগভাষায় অর্থ ছিল উপসাগর। কিন্তু ক্রমে এই উপসাগরের উপকূলের একটি বিশেষ অংশকে বঙ্গদেশ আখ্যা দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন আমলে নাগভাষার অবসাদ ঘটে ও পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ইন্দোইউরোপীয় ভাষা চালু হয়ে যায় আবার গুপ্ত যুগে হিন্দু ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে 'বঙ্গ' কথাটির নাগ ভাষার মূল অর্থ যে "উপসাগর" তা এই প্রজন্মের মানুষ বিস্মৃত হন ও তাঁরা 'বঙ্গ' শব্দটির অর্থে উপকূলবর্তী "দেশ বিশেষ"—কেই মনে করেন। এই সময়কার সংস্কৃত পুরানে লেখা হয় এ অঞ্চলের অসুর রাজা বলি ও তাঁর রানী-সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি রাজ কুমারের জন্মের কথা। যাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এবং তারা যে সব দেশ শাসন করতেন সে গুলির নাম করন নাকি তাঁদের নামানুযায়ীই হয়েছিল। তাই 'বঙ্গ' শব্দটির সঙ্গে উপসাগর কথাটি যুক্ত করার প্রয়োজন মনে করে বঙ্গোপসাগর এই যুক্ত কথাটি রচনা করেন পরবর্তী কালের বঙ্গ উপকূল বাসীরা অবশ্য অষ্ট্রিক ও অষ্ট্রোনেশিয়ান ভাষায় একটি দ্বিত্বী করনের ঝোঁক ও পরিলক্ষিত হয়। সেখানে সচেতন ভাবে সমার্থক শব্দে পুনরুচ্চারিত হয়ে একই বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করে যথা, দোকান—পসার, হাট-বাজার। রাত্রের আকাশের তারাদের যেমন চিনতে পারা যায়না দিনের আলোর ছটায়, যদিও, তারা আকাশেই থাকে সারা দিন। তেমনি সংস্কৃত শব্দের উদ্‌ভাসিত আলোয় অনেক সময় বাংলা ভাষার পলিনেশীয় শব্দ সম্পদকে সনাক্ত করা যায় না। যদিও আমাদের ঘরে ঘরে[3] হুয়রে হুয়রে (whare, whare) বঙ্গ-র[3]—(whanga)-র ভাষায় কথা কওয়ার (Kauwae)[4] সময় তারা ব্যবহৃত হচ্ছে সব সময়। উপরের বাক্যে whare 'whanga' এবং 'Kauwae'[5] কথাগুলি পলিনেশিয় ভাষা থেকে এসেছে। তেমনি কলিঙ্গ কথাটিও এসেছে পলিনেশীয় 'কটিঙ্গ' (Kotinga) থেকে। যার অর্থ হল[6] Division—Boundary' line" অর্থাৎ বিভাগ।

কালিকার মুর্তিকলায় নাগজাতির অবদান

নাগ জাতির মানুষেরা বন্য শিকারীর জীবনকালে যখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের হিংস্রতাও ছিল ভয়ানক, তখন শত্রুকে দেখলে বাঘের মত তাঁরা চক্ষু বিস্ফারিত করে জিহ্বা ব্যাদান করে তাকে আক্রমন করতে আসতেন। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরিরা আজও সেই রূপ আক্রমনের অভিনয় করে দেখান। যার চিত্র শেষাংশে দেওয়া হল।

রনরঙ্গিনী দেবী কালীকার মূর্তি ও এই নাগ জাতীর মনুষেরা কল্পনা করে ছিলেন নিজেদের আক্রমনের ভঙ্গির আদলেই। পলিনেশীয়রা যখন বঙ্গ-কলিঙ্গের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ভূমিতে এসে স্বচ্ছ কৃষিজীবিতে পরিণত হলেন তখন যে পৃথ্বী মাতাকে তাঁরা সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর রণরঙ্গিনী রুদ্র মূর্ত্তি ক্রমশঃ করুণাময়ী মাতৃ মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখা গেল। এই রূপান্তরে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডী দাসের মতন বৈষ্ণব কবিদের ও শ্রীচৈতন্যের মত রাগানুগা ভক্তি সাধকদের অবদান অপরিসীম। বৈষ্ণব কবি ও সাধকদের ভগবান রুদ্র রূপী নন, তিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের দেবতা এবং তাঁর দৃষ্টি ও মুখাবয়ব কোমল মধুর। কিন্তু তাঁদের পক্ষে শাক্ত সমাজে প্রবেশ তেমন সহজ সাধ্য হয়নি সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের দিনে। পরবর্তী কালে কিভাবে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ সমন্বয়ের ভাব গড়ে ওঠে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে তৎকালীন কয়েকটি শাক্ত মন্দির শাক্ত পরিবার ও পুজারীদের রূপান্তর ও ভাবান্তরের পর্যালোচনার মাধ্যমে।

শাক্ত রামচন্দ্র খাঁর শরণাগতি

হুসেন শাহের রাজত্বকালে কলিঙ্গের রাজস্ব সমাহর্তা ছিলেন জলেশ্বর বাসী রামচন্দ্র খাঁ (১৪৮০-১৫৭৮)। এই অভিজাত রাজপুরুষটি ছিলেন নিষ্ঠাবান শাক্তকায়স্থ। তাঁদের কুলদেবী ছিলেন শ্যামা—কালিকা। আজও তাঁর উত্তর পুরুষেরা সযত্নে এই কুল-দেবীর পূজা করেন। ১৫০৯ খ্রীঃ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পুরী যাবার পথে উড়িষ্যায় আসেন তখন উড়িষ্যার অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল। পথে-ঘাটে দস্যু-তস্করের উপদ্রব ছিল যথেষ্ট। সুতরাং রামচন্দ্র চৈতন্য মহাপ্রভুকে একাকী স্থল পথে পাঠানো সমীচিন মনে না করে তাঁকে নৌকা যোগে সাগরে পাঠিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে মহাপ্রভু কাঁথিতে আসেন ও স্থল পথে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে জলেশ্বরে পৌছান ও সেখানে জলেশ্বর নাথ শিবকে পূজা করে পুরী উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চৈতন্য ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে রামচন্দ্রখানের বৈষ্ণব সেবার—এই বিবরণ পাওয়া যায়।

"স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতি প্রেমজলে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া হাসে যত ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন।
সেই প্রেম অধিকারী রামচন্দ্র খান
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান।

* * *

জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র খানেরে কে তুমি
সম্ভ্রম করিয়া দণ্ডবৎ কর যোড়ে।
বলে প্রভু দাসানুদাস মুই তোর,
অবশেষে সর্ব্বলোক লাগিল কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল
নীলাচলে আমি যাই কি মতে সকাল।

* * *

রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়
যে আজ্ঞা তোমার তাহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়
সে দেশে এদেশের কেহ পক্ষ নাহি রয়।
রাজার ত্রিশূল পড়িয়াছে সর্ব্বস্থানে
পথিক পাইলে প্রায় বধিবেক প্রাণে।

* * *

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হইল বিদ্যমান।

(চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য খণ্ড)

এই বিবরণ থেকে স্বভাবতঃ মনে হয় যে শাক্ত হলেও রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম-গুরুকে যথাযথ সমাদর ও সাহায্য করে ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তা স্বীকৃত হলেও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই শক্তি সাধকের দুঃসময়ে তাঁর প্রতি সহমর্মিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হুসেনশাহ ও

শেরশাহের আমলেও শক্তি-সাধক ও বৈষ্ণবদের মধ্যে তেমন মেল বন্ধন ঘটেনি। পরবর্তীকালে শাক্তেরা ক্রমে তাঁদের দেবী ভয়ংকরী শক্তিকে বৈষ্ণবী কোমলতা ও মাধুর্যে ভূষিত করেন। বঙ্গদেশে কালিঘাটের কালিকার মূর্তিকলা ও পাথরটি আনা হয়েছিল উড়িষ্যার নীলাচল থেকে তাই মনে হয় কালীপূজা, খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় সমুদ্রাগত শবরদের দ্বারা।

হুসেন সাহের মৃত্যুর পর ১৫৪০ খ্রীঃ শেরশাহ বক্সারের কাছে চৌসা নামে এক জায়গায় হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন ও বাংলার নবাবের বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি বঙ্গদেশে আসেন। ঐ সময় তিনি রামচন্দ্র খাঁকে বাংলার একটি সুবার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগের সমস্ত জমি তাঁর সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামচন্দ্র খাঁর পৈত্রিক বাসভূমি হাওড়া জেলার বালিতে হলেও তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করার জন্য জলেশ্বরে বসবাস করতেন। কিন্তু তাঁর মন সর্বদাই তাঁর ইষ্টদেবী শ্যামা-কালিকার ধ্যান ও পূজায় নিমগ্ন থাকত, তাই রাজস্ব আদায়ের কাজে তিনি মনোনিবেশ করতে পারতেন না। যে চৌধুরী, জমিদার ও কানুনগোদের উপরে তিনি নির্ভর করতেন তাঁরা যথা সময়ে রাজস্ব সংগ্রহ করতে না পারায় রামচন্দ্র খাঁ একবার সুবার রাজস্ব সময়মত দিতে পারেননি সেজন্য তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেই কারাগারে রামচন্দ্রের মত আরও কয়েকজন শাসক ও সুবাদার কিছু-কাল আগে থেকেই বন্দী জীবন যাপন করছিলেন। সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন রামচন্দ্র। তিনি দুঃখ কষ্টে সহবন্দীদেরও সমব্যথী হয়েছিলেন। রামচন্দ্র খাঁর আত্মীয় স্বজনেরা যখন নবাব সরকারের প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ করে তাঁকে মুক্ত করে আনতে গেলেন, তখন সেই টাকা দিয়ে রামচন্দ্র যে সব শাসক তাঁরও আগে থেকে বন্দী জীবন যাপন করছিলেন তাঁদের দেয় টাকা নবাবকে শোধ দিয়ে তাঁদের মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করে দিলেন। তার ফলে তাঁকে বন্দী দশাতেই আরও কিছুদিন থেকে যেতে হয়।

(ঙ) শাক্ত বৈষ্ণব বিরোধ ঃ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, একবার মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী বহু লোকজন নিয়ে রামচন্দ্র খাঁর দুর্গা মণ্ডপে এসে ওঠেন। শ্রীনিত্যানন্দের ভক্ত, পার্ষদ ও কীর্তনিয়াদের ভীড়ে দুর্গামণ্ডপটি উপচে ওঠে। তখন ভিতর থেকে জনৈক দাস এসে গোস্বামীকে নিবেদন করে যে, তাঁর সঙ্গে অনেক লোকজন থাকায় গোয়ালার প্রশস্ত গোশালাতেই তাঁর স্থান সঙ্কুলান হবে।

এতে শ্রীনিত্যানন্দ নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্র খাঁর দুর্গামণ্ডপ ত্যাগ করেন এবং অভিসম্পাত দেন যে, তাঁর দুর্গামণ্ডপ যে ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য, বৈষ্ণব নিত্যানন্দের যোগ্য নয়। চৈতন্য চরিতামৃত অনুসারে জানা যায় যে, নিত্যানন্দের ভক্ত পরিষদদের কেউ-কেউ অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণের থাকায় তাঁরা স্থান ত্যাগ করার পর দুর্গামণ্ডপটি গোবর জল লেপন করে শোধন করা হয়।

"নিত্যানন্দ গোঁসাই গৌড়ে যবে আইলা
প্রেম প্রচারিতে তার ভ্রমিতে লাগিলা।
আসিয়া বসিল দুর্গা মণ্ডপ ভিতরে
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল।
সেবক বলে গোঁসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমার দিতে বাসস্থান।
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহার সঙ্কীর্ণ স্থান তোমার মনুষ্য অপার ॥
ভিতরে আছিলা শুনি ক্রোধে বাহির হইলা।
সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়।
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা
* * * *
ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাহা বসিলা তার মাটি খোদাইলা।
গোময় জলে লেপিয়া সব মন্দির প্রাঙ্গন।
* * * *
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ম্লেচ্ছ উজির আইলা তার ঘর।
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈলা।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিলা।
স্ত্রী পুত্র সহিত রাম চন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া।
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে শ্রীনিত্যানন্দের অভিসম্পাতেই নাকি রামচন্দ্রকে কারাগারে বন্দী হতে হয় এবং পূর্বোক্ত অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। যে পাঠানেরা তাঁকে বন্দী করতে এসেছিলেন তাঁরা তাঁর দুর্গামণ্ডপে

সেখানে অবস্থান করেন এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষন করে স্থানটি কলুষিত করেন। কিন্তু মনে হয় চৈতন্য চরিতামৃত কারের এই উক্তিটি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত। রামচন্দ্রের কারাগারে দিন যাপন তাঁর পক্ষে "শাপে বর" হয়েছিল। রামচন্দ্র খাঁর বংশ পরম্পরায় প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী শোনা যায়, তাঁর এই বন্দী দশায় নাকি তাঁর কুলদেবী শ্যামা তাঁকে সাক্ষাৎ দেন। যাইহোক, শেরশাহ যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "তোমাকে কারাগারে বন্দী করে ছিলাম রাজস্বের টাকা সংগ্রহ করতে না পারার জন্য। সেই টাকা সংগ্রহ করার পরেও কেন তুমি কারাগারে আছ?" রামচন্দ্র খাঁ তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনি আমাকে কারারুদ্ধ করেন নি। আমি কারাগারে বন্দী হয়েছি আমারই ইষ্ট দেবী শ্যামার ইচ্ছায় তাঁর ইচ্ছাতেই আমি আজও কারাগারে আছি। তাঁর ইচ্ছা হলে আমি আজই মুক্তি পাব"। কালী সাধকদের "শরণাগতির"—ইষ্ট দেবীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার—যে ধারাটি পরবর্তী কালে কবি রামপ্রসাদ ও সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে পরিস্ফুট হয়েছিল—রামচন্দ্রের জীবনেও তার পূর্বাভাস দেখা যায়। বন্দীদশাকালে তাঁর এই মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে শেরশাহ তাঁকে মুক্তি দেন ও "রায় মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তাঁকে বাংলা ও উড়িষ্যার সদর কানুনগো পদে নিযুক্ত করেন।

"রায় মহাশয়"-দের বংশাবলীর ইতিহাসে ও লোক কথা থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র যখন বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার সদর কানুনগো পদের সনদ দুটি নিয়ে বালিতে তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে আসছিলেন তখন পথে গঙ্গাস্নানের জন্য তিনি শেওড়াফুলির কাছে গঙ্গার একঘাটে নামেন। তীরে সনদ দু-খানি রেখে নদীতে নেমে যখন তিনি স্নান করছিলেন তখন একটি শঙ্খচিল বঙ্গ দেশের সনদ খানি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। শঙ্খ চিলকে শাক্তেরা দেবী শক্তির প্রতীক মনে করেন। শাক্ত রামচন্দ্র শঙ্খ চিলের সনদটি নিয়ে যাওয়াকে তাঁর ইষ্ট দেবীর অভীপ্সিত মনে করে সেই সনদ আর ফিরিয়ে নিলেন না। শেওড়াফুলির যে ব্যক্তির বাড়িতে শঙ্খচিল ঐ সনদটি ফেলে দিয়েছিল তিনিই বাংলাদেশের সদর সুবাদার হলেন। শঙ্খ-চিলকে ঈশ্বরের প্রতীক মানার ধারাটিও এসেছে দক্ষিণ সমুদ্র বেয়ে। আজও দেখা যায় ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া এই চিল বা ঈগলকে তার রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। আবার প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে মেক্সিকো ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এই চিল বা ঈগলকে তাদের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। সূর্য যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা আকাশ পরিক্রমা করেন

চিলও তেমনি ডানা মেলে আকাশ পরিক্রমা করে। তাই কোথাও চিলকে সূর্যদেবের প্রতীক আবার কোথাও বা তাকে সূর্যের শক্তি রূপিনী দেবীর কল্পনা করেছেন এই সব দেশের মানুষেরা। আর এই কল্পনার উদ্‌ভব হয়ে থাকবে কোন সমুদ্র কূলবর্তী দেশ, যেখানে সামুদ্রিক মাছের প্রাচুর্যের জন্য মৎস্য শিকারী চিল, গাঙচিল ও শঙ্খচিলেদের আস্তানা বেশি। ল্যাটিন আমেরিকার রূপকথায় ও পুরাণে তাই ঈগল বা "Condor"—এর প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায়। এই ধর্ম বিশ্বাস সম্ভবতঃ পৃথ্বীমাতা কালিকার পূজা অর্চনার মতই পূর্ব সমুদ্র অর্থাৎ প্রশান্তও ভারত মহাসাগর বেয়ে এসে পৌঁছে ছিল বঙ্গ-উপসাগরের কূলে।

(চ) শ্যামসুন্দর ও শ্যামা কালিকার সহাবস্থান ঃ

রামচন্দ্র খাঁ উড়িষ্যার সদর কানুনগোর সনদ নিয়ে জলেশ্বরে আসেন তবে তিনি এই সনদ অনুযায়ী উড়িষ্যার সদর কানুনগোর পদে কাজ করতে পারেন নি। এরপর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোঘল সৈন্য যখন উড়িষ্যার পাঠান সৈন্যের নেতা দাউদকে পরাস্ত করেন তখন রামচন্দ্র মোঘল সম্রাটকে সহায়তা করেন এবং যুদ্ধ শেষে মোঘল সেনাপতি তাঁকে পঞ্চশতী মনসবদার পদে অভিষিক্ত করে জলেশ্বরে থাকতে নির্দেশ দেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে শক্তি সাধক রামচন্দ্র খাঁর তিরোধান হয়। এর প্রায় দেড়শ বছর পরে রামচন্দ্র খাঁর উত্তরাধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের সময়ে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ টোকী ও তাঁর মুসলমান অনুচরেরা জলেশ্বরের জলেশ্বরনাথের শিব মন্দির কলুষিত করেন এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। তখন লক্ষ্মীনারারণ রায় জলেশ্বর থেকে কিছু দূরে লক্ষ্মণনাথে তাঁর বাসভবন স্থানান্তরিত করেন। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লক্ষ্মীনারায়নের পুত্র জয় নারায়ণ রায়ের আমলে তাঁদের লক্ষ্মণ নাথ প্রাসাদ প্রাঙ্গনের দেব মন্দিরে কুলদেবী শ্যামা-কালিকার মূর্তির সঙ্গে শ্যাম-সুন্দরের মূর্তির ও পূজার প্রবর্তন করা হয়। ১৭৪৫ খৃঃ মহারাষ্ট্রের পেশবা রঘুজী ভোঁসলে যখন মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অধিকার করেন সেই সময়ে তাঁর দেওয়া একটি তাম্র পত্রে দেখা যায় জয়নারায়ণকে শ্যামা সুন্দরী ও শ্যাম-সুন্দরের নিত্যপূজার জন্য ২০২৩ বিঘা জমি দান করেছিলেন এই হিন্দু পেশবা। কালাপাহাড় ও মহম্মদ টোকী প্রভৃতি হিন্দু বিদ্বেষী মুসলমানদের হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার ফলে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈরী ভাবের অবসান হতে থাকে এবং তাঁদের দেবতারা একই মন্দিরে পূজিত হতে থাকেন। এই ভাবে ভয়ঙ্করী শ্যামা কালিকা রায় মহাশয়দের লক্ষ্মণ নাথ ভবনের মন্দিরে শ্যামা-সুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ

করে শ্যাম সুন্দরের সঙ্গে একই মন্দিরে পূজিত হতে থাকলেন। আজও উড়িষ্যার লক্ষ্মননাথে রায় মহাশয়দের এই মন্দিরে যেমন শ্যাম-সুন্দরের ভোগ রাগ, পূজা ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় তেমনি শ্যামা-সুন্দরী কালিকার তান্ত্রিক পূজা, বলি, ছাগবলি ও অনুষ্ঠিত হয় একই মন্দিরে এবং মন্দিরাঙ্গনে। ঠিক এই ভাবেই শক্তি রূপিনী কালিকাকে বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস হয়েছে বঙ্গদেশের কালীঘাটেও।

(ছ) কালিঘাটের বৈষ্ণব পুরোহিত ভবানী দাস ঃ

আমরা জানি উড়িষ্যার নীল গিরি থেকে পাথর এনে কালীঘাটে কালী-মূর্তি খোদাই করে ছিলেন ব্রহ্মানন্দ ও আত্মারাম ব্রহ্মচারী। তাঁদের মৃত্যুর পর আনন্দগিরি এই পূজা ও ছাগবলি ইত্যাদির ভার নেন। এই ভাবে পর পর গুরু শিষ্যাদি ক্রমে গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা দেবী পূজার ভার নিয়ে ছিলেন —তাঁরা ছাগ ও মহিষ বলি দিয়ে পূজা করতেন ভয়ংকরী রণ-রঙ্গিনী কালিকাকে। এই শক্তি ক্ষেত্রের আশপাশের জঙ্গলে গড়ে উঠেছিল কাপালিকদের আশ্রম—সেখানে তারা নরবলি দিয়ে পূজা করতেন এই ভয়ংকরী দেবীকে। ভুবনেশ্বর গিরি যখন কালীঘাট শক্তি পীঠের অধ্যক্ষতা করেন সেই সময় ভবানীদাস চট্টোপাধ্যায় নামে এক যুবক বর্ধমানের খন্যান গ্রাম থেকে তাঁর গৃহত্যাগী পিতা রত্নগর্ভ চট্টোপাধ্যায়কে অনুসন্ধান করতে আসেন। ভবানীদাসের আচরণে প্রীত হয়ে পুরোহিত ভুবনেশ্বর গিরি তাঁর কন্যা উমার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। এরপর ভবানীদাস কালীঘাটেই দেবীর সেবায় নিযুক্ত হয়ে থেকে যান। কিন্তু তিনি ছিলেন বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত। খন্যান থেকে ভবানীদাসের প্রথমা স্ত্রী তাঁর দুটি পুত্রকে নিয়ে কালীঘাটে এসে উপস্থিত হন। এরপর তাঁর কুলদেবতা বাসুদেবের পূজার্চনা ঠিকমত না হওয়ায় ভবানীদাস বাসুদেবকেও নিয়ে আসেন কালীঘাটে এবং স্থাপন করেন কালী মন্দিরের দেওয়ালে একটি কুলঙ্গিতে। প্রতিদিন দরিদ্র নারায়নের সেবার জন্য যে নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা ছিল তাই তিনি প্রথমে বাসুদেবের ভোগরূপে উৎসর্গ করতে লাগলেন। এছাড়া দেবীর নিত্যপূজার সময়ে তাঁর নৈবেদ্যের সঙ্গে বাসুদেবকেও সামান্য নৈবেদ্য ভোগ দিতে লাগলেন। এভাবে কিছুদিন যাবার পর তাঁর মনে হতে লাগল শ্যাম আর শ্যামা অভিন্ন। তাই তিনি শ্যামা কালিকাকেও শ্যাম সুন্দরের মত তিলকে ভূষিত করলেন, আর দেবীর সিঁন্দুরের রঙে ভূষিত করলেন বাসুদেবকেও। আজও কালীঘাটের কালিকার নাসিকায় তিলকের এই চিহ্নটি রণ-রঙ্গিনী কালিকার বৈষ্ণবী শ্যামা-সুন্দরীতে রূপান্তরের নিদর্শন হয়ে আছে। কিন্তু কলিকাতা তথা বঙ্গদেশে বীরভাবোদ্দীপক

ভয়ঙ্করী কালিকার মূর্তি পূজার ও বীরভাবে সাধনার প্রথা সদা প্রবহমান। এর থেকে শুধু দস্যু ও ডাকাতেরাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিযুগে—বিপ্লবীরাও তাঁদের মুক্তি যুদ্ধের সাহস ও প্রেরণা পেয়েছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে দেশমাতৃকা ও কালিকাকে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন।

শান্ত সুন্দর মধুর ভাব থেকে দেবীশক্তির স্বকীয় মহিমায় বীরভাবে প্রত্যাবর্তনের ধারাটিকে সাম্প্রতিক মৃত্তিকলায় দেখা যাচ্ছে। এই ভয়ঙ্করী মূর্তির পূজা ও বীরভাবের সাধনার ধারাটি অক্ষুন্ন রেখেছেন কলকাতার নব সঙ্ঘের মত কোন কোন শক্তিসেবকেরা—যাঁরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে—যেমন কখনও হিমাচল কখনও বা দাক্ষিণাত্য থেকে এবং বিভিন্ন ধর্ম থেকে কখনও হিন্দুশক্তি কখনও বা বৌদ্ধ ধর্ম থেকে বুদ্ধ-শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্তি গড়ে আজও দীপাবলীতে পূজা করেন (তাঁদের মণ্ডপের মূর্তির ছবি ও পরিচিতি পরিশিষ্টে দেওয়া হল)। দেশ মাতৃকার এই রণ-রঙ্গিনী মূর্তির কাছে তাঁর সন্তানেরা যুগে যুগে প্রার্থনা করে আসছেন-দেশের শত্রুবিনাশের : "রূপংদেহি, জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষোজহি।"

(জ) মাধব রায় ও শ্যামাকালী :

আমরা ঋগ্বেদের দেবী সূক্তে দেখি যে দেবী ঘোষণা করছেন "অহংরাষ্ট্রী—আমিই রাষ্ট্র, আমিই মাতৃভূমি"। সেনরাজ্যের রাষ্ট্র লক্ষ্মী বা রাজ্যলক্ষ্মী হিমাচল প্রদেশে আজও পূজিত হন রাজেশ্বরী (বা শ্রীবিদ্যা) নামে। তিনি রক্তাম্বর ধারিনী ও চতুর্ভুজা। তাঁর একহাতে মানুষের মাথার খুলি ও অন্যহাতে অঙ্কুশ ও অন্য দুই হাতে তীর ধনুক। এদিকে রাজপুরোহিতেরা তাঁদের যে কুলদেবী বগলামুখীকে হিমাচল প্রদেশে এনেছিলেন, তিনিও একহাতে উদ্যতা গদা নিয়ে অন্যহাতে তিনি অসুরের জিহ্বা টেনে ধরে আছেন। আবার এই সেনবংশেরই উত্তরপুরুষ রাজা সূর্যসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে মাধোরায়ের (মাধবরায়ের) মধুর মুরলিধর মূর্তি ও মন্দিরটি স্থাপন করেন এবং তিনি নিজেকে তাঁর সেবকরূপে উৎসর্গ করে রাজ্যের সমস্ত ধনসম্পদ মাধব রায়ের নামে দান করেন। এভাবে বৈষ্ণব সাধনার শান্ত মধুর ভাব যখন রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল তার মাত্র এক দশক পরেই ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্যামসেন টারনা পাহাড়ে শ্যামাকালীর ত্রিমূর্তী করাল মূর্তি স্থাপন করে আবার বীর ভাবের সাধনাকে ফিরিয়ে আনেন। এইভাবে পৃথ্বীমাতা কালিকা বিরাজ করছেন শুধু বঙ্গদেশে নয় দেশে দেশে যেমন হিমাচলে তেমনি উড়িষ্যার উপকূলেও—যেমন ভারতের ভূতলে তেমনি পেরুর পাতালেও।

পরিশিষ্ট—ক

কালিঘাটের তথা কলিকাতার উন্নয়নে শাক্ত বল্লালসেনের অবদান

কালিঘাট শক্তি সাধনার পীঠস্থান সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকেই। অষ্টম শতাব্দীতে আদিশূর যে পঞ্চব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ক্ষিতিশ দেবশর্মা। আদিশূর তাঁকে বসবাস করার জন্য মানভূম জেলার পঞ্চকোট গ্রামে ভূমিদান করেন। নিকটবর্তী কোন চতুষ্পাঠী না থাকায় তাঁর চতুষ্পাঠী ও তীর্থস্থান নিধারিত হয়েছিল এই কালিঘাটেই।

পুরাকালে হিন্দুরা এই স্থানকে কালিক্ষেত্র (বা কালিখাতা) বলত। কলিকাতা নামটি এই কালিক্ষেত্র বা কালিখাতার অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক। বল্লাল সেন এই স্থানটি 'সেরা'র বংশধরদের হাতে দিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। বল্লাল সেনের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব (বন্‌তন্ত্রের কুণ্টুজাংপো)। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি অনিরুদ্ধ ভট্ট নামে এক বৌদ্ধ তান্ত্রিকের অধীনে তন্ত্রসাধনা শুরু করেন। বন্‌তান্ত্রিকেরা যেমন অঙ্কিত মণ্ডলে বসে বামাচার সাধনা করতেন সেই সাধনার ধারা বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করে এবং বৌদ্ধধর্মে শবরীসাধন ইত্যাদি প্রচলিত হয়। বল্লাল সেনও এইরূপ ডোমচণ্ডাতির এক কুমারীকে এনে সিদ্ধিলাভের জন্য শক্তি সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বল্লাল সেনের জীবনে তান্ত্রিক গুরুর প্রভাবে পিতা বিজয় সেনের নিষেধাজ্ঞাও কার্যকরী হয়নি। তাঁর এই তন্ত্রপ্রীতির ফলস্বরূপ যে মিশ্রিত শৈববৌদ্ধ তন্ত্রাচারের প্রচলন ঘটে তার মধ্যে নীলের ব্রত অন্যতম। 'বৃহন্নীলাতন্ত্রম্' গ্রন্থে 'দেবী' কিভাবে নীল সরস্বতীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা ও পূজাবিধি লিখিত হয়েছিল (বৃহন্নীলাতন্ত্রম্ একাদশ পটল)।

বল্লাল সেন সিংহাসনারোহন করার পর একদিন সিংহগিরি নামে এক শৈবতান্ত্রিক তাঁর রাজসভায় আসেন ও তাঁর তান্ত্রিক শক্তির পরিচয়ে বল্লাল অভিভূত হয়ে তাঁর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর অশোক যেভাবে বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্মে পরিণত করেন তিনিও তেমনি তাঁর রাজ্যে ধর্মাধ্যক্ষ, শান্তিবারিক, প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সৃষ্টি করে তাতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করেন এবং শুধু নিজরাজ্যেই নয় প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেও শক্তিসাধনা প্রচলনের জন্য তিব্বতে তিরিশজন, মোরঙ্গে ষাটজন, উৎকলে বাইশজন ও রভঙ্গে বাইশজন

হিন্দুতান্ত্রিক পাঠিয়েছিলেন। এইসব তন্ত্রাচার্যদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে শক্তিসাধনা প্রচলিত হয়। গুজরাট, পাবাগড়, ও পাটন প্রভৃতি স্থানের শাসকেরা ও তাদের পরিজনেরা বাঙালী তান্ত্রিকদের কাছে শাক্তমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন— এসব কথা উল্লিখিত আছে আগমপ্রকাশে (আগমপ্রকাশ ১।১২)

এই প্রচারের ফলস্বরূপই ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহাররাজ নরনারায়ণ রাঢ় দেশ থেকে বহু তান্ত্রিককে নিয়ে গিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অহোমরাজ নদীয়ার এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের হাতে কামাখ্যা মন্দিরের ভার অর্পণ করেন। তাঁর বংশধর পর্বতীয়া গোঁসাইরা ঐ মন্দির পরিচালনা করতে থাকেন। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে সমগ্রদেশ গৌড়ের নেতৃত্ব মেনে নেয়।

শক্তি সাধনাকে জনপ্রিয় করার জন্য বল্লাল সেন একদিকে যেমন দেশবিদেশে প্রচারক পাঠিয়েছিলেন অন্যদিকে আবার নিজ রাজ্যের তন্ত্রাচার্যদের নানাভাবে উৎসাহ দান করেন। তাঁর নির্দেশেই বৌদ্ধ ও শৈব-তান্ত্রিকেরা পরস্পরের বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। গৌড় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধকার হিন্দি পত্রিকা 'ধর্মযুগ' (১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪)-এ লেখেন যে তান্ত্রিকেরা যাতে অবাধে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মকর্ম সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য বল্লাল সেন উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিকোণাকার ভূভাগ তাঁদের জন্য সংরক্ষিত করেন। কালিঘাট ছিল এই কালিকাক্ষেত্রের নাভিকেন্দ্র।

১৯৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠার তিনশতবর্ষ পূর্তির যে উৎসবটি হয়ে গেল তা' বাঙালীর আপন ইতিহাস বিষয়ে আত্মবিস্মৃতির এবং অতীতের প্রভু ইংরাজদের গরিমা যে আজও তাদের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে—তার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বঙ্গে তখন তুর্কী শাসনের অবসান বেলা। চণ্ডীমঙ্গল প্রকাশের কিছুকাল পরে মোঘল যুগের সূত্রপাত হয়। ইংরাজ তো দূরের কথা পর্তুগীজেরাও তখনও বঙ্গদেশে পদার্পণ করেনি। সেই সময়কার রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা কলিকাতা গ্রাম ও কালিঘাটতীর্থ উভয়েরই অবস্থান ও স্থান কালের দূরত্বের বর্ণনা ও বিবরণ পাই:—ধনপতি সওদাগর তাঁর পুত্র শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়দেশের মঙ্গলকোটের উজানী নগর থেকে সাগর পারে বাণিজ্য করতে চলেছেন।

তাঁদের জাহাজ ভাগীরথির উপর দিয়ে ভেসে চলেছে তড়িৎ গতিতে বঙ্গোপসাগরের দিকে—চিৎপুর ও শালকিয়াতে না থেমে। কলিকাতাকেও পাশে ফেলে গেল সেই বাণিজ্যতরী, কেননা বেলা তখন শেষের দিকে। কিন্তু বেতড়েতে নেমে বেতাই চণ্ডীর পূজো দিলেন সওদাগর। আর ডাইনে হিজলীর যে পথ গেছে, তা এড়িয়ে সওদাগর আরও কিছু দূর গিয়ে, বেলা শেষে এসে পৌছলেন কালিঘাটে। তাঁদের রাতের বিশ্রামস্থল হল এই কালিঘাট।

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর শালিখা এড়াইয়া যায় ॥
বেতড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা ॥
বেতাইচণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
সমস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে।
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
বালিঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালিঘাটে গেল ডিঙ্গি অবসান বেলা ॥

প্রভাতে মাকালীকে পূজো দিয়ে আবার শুরু হবে চলা। শুধু মঙ্গল কাব্যের ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা বর্ণনাতেই নয়, তারও পরবর্ত্তীকালের মোঘল সরকারের দলিলদস্তাবেজেও কলিকাতার উল্লেখ আছে। আকবরের রাজস্ব সচিব তোড়রমল রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবে বাংলাকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করেন তার মধ্যে একটি ছিল সপ্তগ্রাম বা সরকার সাতগাঁও। এই সরকারের মধ্যে অবস্থিত ছিল কলিকাতা, মেকুমা ও বড়বাকপুর (বর্তমান ব্যারাকপুর) এই তিনটি মহল। এই মহলগুলি থেকে মোঘল রাজকোষে বৎসরে নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত পনের দাম রাজস্ব সংগৃহীত হত। (Abu Fazal Allam : *Ain—I Akbari*. Trans R Kennaway P. 472) এ থেকে বোঝা যায় এই মহলগুলি রীতিমত সমৃদ্ধ পত্তন হয়ে উঠেছিল সাগর পারের বাণিজ্যতরী যাতায়াতপথে অবস্থিতি ও পণ্যদ্রব্যসম্ভার আদানপ্রদানের জন্য।

এই পর্তুগীজেরা ১৫৭৯ খৃঃ এদেশে এসে সপ্তগ্রামের উপকণ্ঠে হুগলীকে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের যথোপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচন করেন। জাহাজ মেরামতের সুবিধা, পথঘাট, প্রশাসনিক ও স্থানীয় নাগরিক সুবিধা এবং শ্রমিক শ্রেণী ও

বাণিজ্য বিপনির অবস্থান দেখেই পর্তুগীজরা যেমন হুগলীকে উপযুক্ত স্থান মনে করে তাদের কুঠি স্থাপন করেছিলেন, তার একশত বৎসর পরে অনুরূপ সমৃদ্ধি ও অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির জন্য তেমনি ইংরাজ বণিক জবচার্ণকও কলিকাতাকে কুঠি স্থাপনের জন্য নির্বাচন করেছিলেন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। জবচার্ণককে তাই কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বা কলিকাতাকে মাত্র তিনশত বৎসরের অর্বাচীন নগরী ভাবলে মহা ভুল করা হবে। শাক্ত বল্লাল সেনের কালীঘাট ও সমগ্র কলিকাতাক্ষেত্র অর্থাৎ কলিকাতার উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা শুধু বাঙালীর গৌরবময় উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করাই নয় তা হবে প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাংলা সাহিত্যের বিবরণ, তৎকালীন লেখ ও লোককথার সাক্ষ্য, মোঘল-সরকারের দলিল দস্তাবেজ ও আবুলফজলের মতো ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষ ও বাস্তবিক বিবরণকে অগ্রাহ্য করার সামিল।

———

পরিশিষ্ট—খ

বঙ্গের মহিষমর্দিনী দুর্গার পূজায় মহীশূর-কর্ণাটক সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষে শিব পূজার প্রচলনের অনেক পরে দুর্গা-পূজার প্রচলন হয়। শিব যখন সর্বত্র পূজা পেতেন, দুর্গা তখন সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁর গৌড় কাহিনীতে লিখছেন যে সেন যুগের পূর্বে সারা ভারতে মাত্র একটি দুর্গামন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলায় অবস্থিত আই-হোলের দুর্গামন্দির। সেখান থেকেই সেনরাজারা দুর্গা পূজার ধারাটি গৌড়ে এনেছিলেন। কর্ণাটকের সেই মন্দির ও দেবীপ্রতিমা আজও সেখানে বর্তমান। কর্ণাটকের ঘরে ঘরে আজও চণ্ডীপাঠ হয়। সেখানকার দশেরার উৎসবের সমারোহ প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। কানাড়ী হরফে মুদ্রিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ আজও কর্ণাটকীরা প্রতিনিয়ত পাঠ করে থাকেন।

আই-হোলের এই দুর্গামন্দিরটি চালুক্যবংশীয় রাজারা নির্মাণ করেছিলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে। একাদশ শতাব্দীতে বল্লালবংশের রাজারা কর্ণাটকের পশ্চিমার্ধ অধিকার করেন। তখন সেখানে চামুণ্ডা পাহাড়ের উপরে তাঁরা পাথরের অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে নিয়মিতভাবে তাঁর পূজা হয়। মহীশূরের জনসাধারণ এই দেবীকে মহীশূর রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলে মনে করেন। শারদীয়া শুক্লপক্ষে এই চামুণ্ডা মন্দিরে যখন দেবীর অর্চনা চলতে থাকে তখন মহীশূররাজ সপরিবারে সেখানে উপস্থিত হয়ে নবমীর দিন পর্যন্ত দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করেন। এই নবরাত্রের পর আসে 'দশহরা' বা দশেরা। ঐদিন অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহণে, কামানের গর্জনে আর জনগণের কলরোলে সমগ্র মহীশূর মন্দ্রিত ও মুখর হয়ে ওঠে।

এই কর্ণাটকী শক্তি সাধনার ধারাই সেন রাজগণের সঙ্গে গৌড়ে আসে ও গৌড়ীয় বৌদ্ধ ও শৈবতন্ত্র সাধনার মিশ্রিত ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নূতন শক্তিপূজাপদ্ধতিতে পরিণত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভিত্তিতে কোন গৌড়ীয় তান্ত্রিক সে সময় একটি কালিকা পুরাণ রচনা করেন, দুর্গোৎসবের পূজাপদ্ধতির পরিকল্পনা পাওয়া যায় এই পুরাণে। এই পুরাণের বর্ণনানুসারে ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হয়ে উঠলে সব দেবতারা নিজ নিজ দেহ থেকে যে তেজ উৎপন্ন করেন, তা একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তির উদ্ভব হয়, তিনিই দুর্গা। মহিষমর্দিনীরূপে তিনি পূর্বে কর্ণাটকের মহীশূরে পূজা পাচ্ছিলেন। সেন রাজারা সঙ্গে

নিয়ে আসেন তাঁর রূপকল্পনা ও মূর্তিকলা বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের শৈব-বৌদ্ধ ধারার সঙ্গে মিশে তা সাঙ্গীকৃত হয় বঙ্গীয় সমাজে। দেবীর প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে তন্ত্র ও পুরাণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর পূজার্চনা যে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে এরূপ নির্দেশ কালিকা পুরাণে দেওয়া আছে। পূজার উপকরণগুলিতে কিন্তু গৌড়ীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নৈবেদ্যের বিভিন্ন ফল, মূলের সঙ্গে বলি হিসাবে 'স্বগাত্র রুধির,' নর রুধির ও বিভিন্ন পশুর মাংস, কচ্ছপ এবং রোহিত মৎস্যের যে বিধান আছে, তা কর্ণাটকী পূজোপচারের বাইরে। মহানির্বাণ তন্ত্রের মতে শোল, শাল এবং বোয়াল মাছ দেওয়ারও বিধি আছে। বৌদ্ধতন্ত্র থেকে তখন সবেমাত্র শৈবতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটায় দেবীর পূজায় সুরা দেওয়াও শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করা হয়। এগুলিও বঙ্গের বিশেষ সংযোজন। কর্ণাটকে এইরূপ কোন প্রথা প্রচলিত ছিলনা। সেখানকার দেবী প্রস্তরময়ী—তাই অপরিবর্তনীয়া। কিন্তু এখানকার মৃন্ময়ী—দেবীমূর্তির মুখমণ্ডল নির্মান করতে গিয়ে বাঙ্গালী মৃৎশিল্পীরা তাঁর মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন পালযুগের বৌদ্ধদেবী আর্যতারার সুন্দর সুডৌল মুখশ্রী। আর দেবীর দেহ তাঁরা রঞ্জিত করেছেন পর্ণশবরীর গায়ের রঙে। ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন এই প্রতিমাকে পূজা করা হয় বিল্বশাখা দিয়ে, অষ্টমীর দিন অন্যান্য বিশেষ উপচারে ও ভক্তের নিজস্ব বলিদান দিয়ে। নবমীর দিনে প্রচুর পশু বলিদান দেওয়া হয় দেবীর উদ্দেশে। আর দশমীতে শবরোৎসবের অনুষ্ঠান করে তাঁকে নদীতে বিসর্জনের বিধি প্রচলিত হয়েছিল বঙ্গে। শবরোৎসব মূলতঃ বৌদ্ধদের উৎসব।

প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজা রাজসূয় যজ্ঞ। কালিকাপুরাণের নির্দেশানুসারে রাজারাজড়ারা বর্ষা অপগত হলে যুদ্ধ যাত্রার প্রকৃষ্ট সময় এলে শরৎকালে তান্ত্রিকাচারে এই উৎসব পালন করতেন। সেনবংশের রাজত্বকালের শুরুতেই জীকন ও বালক নামে দুইজন তান্ত্রিক, রাজার আদেশে শারদীয়া পূজার প্রথম আয়োজন করেন। সমসাময়িক সাহিত্যে তাঁদের নামের উল্লেখ আছে কিন্তু বিবরণ নেই। এই সময়ে রচিত জীমূতবাহনের 'দুর্গোৎসব নির্ণয়' এবং শূলপানির 'দুর্গোৎসব বিবেক', 'বাসন্তী বিবেক', 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামক পুস্তকগুলি এখনো বিদ্যমান রয়েছে। জীমূতবাহন ছিলেন বিজয়সেনের প্রাড়্‌বিবাক। শূলপাণি সম্ভবতঃ রাজপুরোহিত ছিলেন। মাণ্ডিতে শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্বম্'-এর বঙ্গাক্ষরে লেখা সংস্কৃত ভাষার একটি পুঁথি আবিষ্কার করে হিমাচলপ্রদেশ লোকসংস্কৃতি সংস্থানের সংগ্রহশালায় রেখেছেন। এর থেকে

প্রমাণ হয়, সেন বংশের উত্তরপুরুষেরা বঙ্গদেশ থেকে দুর্গাপূজা পদ্ধতি নিয়ে গিয়েছিলেন মাণ্ডীতে। বঙ্গে রাজার অনুসরণে সামন্ত, ভূস্বামী ও বণিকশ্রেণী নিজ নিজ গৃহে দুর্গোৎসব শুরু করেন। যে সব বাঙ্গালী মৃৎশিল্পী পাল আমলে বৌদ্ধমূর্তি তৈরী করতেন তাঁরাই আবার সেন যুগে দুর্গাপ্রতিমা তৈরী করতে শুরু করেন। ক্রমশঃ শারদীয়া পূজা সেন রাজ্যের সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

গৌড়দেশ ব্যতীত মিথিলা ও নেপালেও মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তির পূজাবিধি প্রচলিত আছে ও সেখানে পূজারীতিও গৌড়েরই অনুরূপ। এই সাদৃশ্যের অন্তরালেও মহীশূর কর্ণাটকের অন্য এক রাজবংশের প্রভাব বিদ্যমান। হেমন্ত সেন যখন রাঢ়ে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন তখন তাঁরই মত কলচুরী রাজের একজন কর্ণাটকী সৈন্যাধ্যক্ষ নান্যদেব মিথিলা জয় করে এক স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে দুর্গাপূজার ঢেউ নেপালে গিয়ে লাগে। উভয়রাজ্যে যখন বৌদ্ধতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর শৈবতন্ত্রের উদ্ভব হ'চ্ছে তখন অনিবার্য কারণেই দুর্গাপূজা জনপ্রিয় হতে বেশী সময় লাগেনি।

মিথিলায় বাচস্পতি মিশ্র ও সর্বোরু মিশ্র এ বিষয়ে জনসাধারণকে পথনির্দেশ দেন। বাচস্পতি মহাশয়ের দুর্গোৎসব প্রকরণম্ ও সর্বোরু মহাশয়ের 'ক্রিয়াচিন্তামণি'—দুর্গাপূজা সম্বন্ধে দুইখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। কয়েক শতাব্দী পরে বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করেন ও পূজার বিধিতে যথেষ্ট মাধুর্য আনেন। আর নেপালে জগৎ প্রকাশ মল্ল ও রণজিত মল্ল প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা মহাশক্তি সম্বন্ধে বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন। বাংলার আগমনী গান তো স্বর্গের দেবী দুর্গাকে তাঁদের কন্যারূপে এনে দিয়েছে প্রতি বাঙ্গালী পরিবারের ঘরের আঙ্গিনায়। দশমীর দিনে বিসর্জনের সময় বঙ্গের সিমন্তিনীরা প্রতিমার মাথায় সিন্দুর দিয়ে সজল চোখে তাঁকে বিদায় দিয়ে ভাবেন—কন্যাকে তাঁরা জামাতার বাড়িতে পাঠাচ্ছেন। বাংলার কবি মধুসূদন বিষাদের উপমা খুঁজে পান প্রতিমা বিসর্জনের পর নদীতীর থেকে ঘরে ফেরার পালায়।

পরিশিষ্ট—(গ)

ফকিরের খারকা প্রস্তুত করে দিয়েছিল মুসলিম বিজয়ের জমি

বখ্‌তিয়ার খ্‌লজি অস্ত্রের সাহায্যে ও অপকৌশলে বাংলা বিজয় করার আগে থেকে মুসলিম ফকির দরবেশরা বঙ্গে অনুপ্রবেশ করে ও কিছু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করে তাঁরা বাংলা—তথা ভারতবর্ষে ইসলামের প্রসার ঘটানোতে—বঙ্গে তথা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম অধিকরের জন্য জমি প্রস্তুত হয়েছিল। সুলতান মামুদ খলিফা-এল-কাদির-এর কাছ থেকে ইসলাম ধর্ম প্রসারণের দায়িত্ব নিয়ে হাজার হাজার মন্দির ধ্বংস করেছিলেন এবং হিন্দুসেনাপতি সুখপালের মতো হিন্দু ক্ষত্রিয়কে কলমা পরিয়ে মুসলমান করে মুলতানের শাসক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মামুদ চলে যাওয়ার পর তিনি দলবল সহ প্রায়শ্চিত্ত করে সনাতন ধর্মে ফিরে এলেন। তাই শুধু অস্ত্রবলে ভারতে অধিকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সুলতান মামুদের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ মাসাউদ গাজি সৈনিকের সামরিক পোষাক খুলে ফেলেন এবং পীরের খারকা পরে আবার ফিরে আসেন ভারতে। তাঁর উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরী হয় কয়েকটি মসজিদ। এবং সেগুলি ঘিরে ছোট ছোট মুসলিম উপনিবেশ গড়ে ওঠে। খলিফার অনুমতি ও অর্থ সাহায্য নিয়ে ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ শহরে নিজামিয়া মাদ্রাসা নামে একটি মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই নিজামিয়া মাদ্রাসায় একদিকে যেমন সাদির মতো শ্রেষ্ঠ কবি অধ্যয়ন করেছেন, তেমনি ধর্ম বিষয়ে আজমীরের পৃথ্বীরাজের সমকালীন, শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তি ও গৌড়ের লক্ষ্মণসেনের সমকালীন, জালালুদ্দীন মখতুম শাহ্ তাব্রেজীর মতো সৈনিকেরাও অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন। সেখ মৈনুদ্দিন চিস্তি ৪০ জন অনুচর নিয়ে দিল্লীতে চলে আসেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য। দিল্লী থেকে তিনি আসেন পৃথ্বীরাজের রাজধানী আজমীরে। আনাসাগরের তীরে গড়ে ওঠে তাঁর আশ্রম। পৃথ্বীরাজ এই পীরের ধর্ম প্রচার বন্ধ করার জন্য সময়োচিত দৃঢ়তা দেখাতে পারেন নি। তার ফলে শেখ চিস্তি অজয় পাল প্রমুখ ৭০০ লোককে ইসলামে দিক্ষীত করেন এবং পরে স্বয়ং পৃথ্বীরাজের কাছে আহ্বান পাঠান ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য। পৃথ্বীরাজ অবশ্য যথোচিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তরাইনের

দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হলে বিজয়ী মহম্মদ ঘোরী রণক্ষেত্র থেকে সোজা চলে আসেন আজমীরে শেখ চিস্তির আস্তানায় একথা বেগ সাহেব লিখে গেছেন তাঁর খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির পুণ্যজীবন কথায় (Begg M. W—*Holy Biography of Khwaja Moinuddin Chisti*, pages 42—67).

মৈনুদ্দিন চিস্তির মতোই নিজামিয়া মাদ্রাসার ছাত্র শেখ জালালুদ্দিন মখদুম শাহ তাব্রেজী গৌড়ে এসেছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে। লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে এই শেখের প্রথম সাক্ষাৎ হয় গঙ্গাতীরে। রাজার মহামন্ত্রী হলায়ুধও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে এই শেখের বিভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতাও কাহিনী নিয়ে "সেক শুভোদয়া" নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি-লক্ষ্মণসেন পীরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তাঁকে রাজ সভায় আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি মসজিদ নির্মানের জন্য পীরকে পাণ্ডুয়ায় একখণ্ড জমি দান করেন। রাজ মহিষী ও রাজকবি পীরের ভক্ত হন। ঘনিষ্টতা হয়। পীর বিপুল পরিমান অর্থ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে পীরের কাছ থেকে উপহার পেতেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁকে সন্দেহ না করলেও, তাঁর বিরোধী ছিলেন সভাসদ উমাপতি ধর। সন্দেশের সঙ্গে একবার বিষ মিশিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেন পীরকে। তাতে ফল বিপরীত হয়। তিনিই জনসাধারণের কাছে হেয় হন এবং পীরের প্রভাব আরও বেড়ে যায়।

পীরের আগমনের কিছুকাল পরে বখ্‌তিয়ার খলজী যখন নবদ্বীপ জয় করেন তখন পীরের প্রভাবে হিন্দু প্রজারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুলে তুর্কী শাসন মেনে নেয়। পরে তাঁরই আদেশে পাণ্ডুয়ায় সমস্ত মঠ ও মন্দির ধ্বংস হয়। হলায়ুধের এই 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে আমরা সমকালীন সমাজের চিত্র পাই। সেখানে একদিকে যেমন রাজা লক্ষ্মণসেন ও তাঁর অধিকাংশ প্রজা ও মন্ত্রীর তত্ত্বানুসন্ধানের, ধার্মিক সমদর্শন ও সহিষ্ণুতার উদাহরণ আছে, তেমনি আছে সভাপণ্ডিত গোবর্ধনার্যের মতো সভাসদদের ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষার জন্য তেজস্বী সংঘর্ষের বিবরণ—যা নীচে নাট্যাকারে বিবৃত হয়েছে।

পরিশিষ্ট—(ঘ)

গোবর্ধনাচার্য ও বণিকবধু মাধবীর কাহিনী

হলায়ুধ মিশ্রের 'সেকশুভোদয়া' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই কাহিনীটি পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাঁর সভার স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ কবি ও উপদেষ্টা গোবর্ধনাচার্য তাঁর সত্যনিষ্ঠা, সততা ও স্বতন্ত্রতার যে সব উদাহরণ রেখে গেছেন তার মধ্যে বিশিষ্ট হল 'বণিকবধু মাধবীর কাহিনী' এবং সেই কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হল এই নাটিকা।

প্রথম দৃশ্য

(সরোবর তটে সদ্যোস্নাতা মাধবী তার স্নানরতা সঙ্গিনীদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নিজের এলো চুল শুকিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই সময় সেখানে তৃষ্ণার্ত রাজশ্যালক কুমারদত্ত উপস্থিত হলেন জলপানার্থে। মুক্তকেশী সদ্যোস্নাতা সুন্দরী মাধবীকে দেখে তিনি কামুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন)

রাজশ্যালক ঃ হে সুন্দরী, আমার দিকে ফিরে চাও আমাকে ভজনা কর। রাজকোষ থেকে যে মুদ্রা তুমি পাও তার চেয়ে অনেক বেশী মুদ্রা আমি তোমায় দেব—যদি আমায় একটু সঙ্গ দাও। তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ এবং লাবণ্যলীলতায় বশীভূত। তোমার আজ্ঞা আমি সর্বদা পালন করব। তোমার সব চাহিদা পরিতৃপ্ত করব।

(মাধবী নিরুত্তর ; মাধবীকে ধনলোভে প্রলুব্ধ করতে না পেরে অবশেষে রাজশ্যালক কুমারদত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।)

কুমারদত্ত ঃ আজ আমি রাজ ভয়েও ভীত নই। আমি আমার ইচ্ছামত কাজ করব।

(তবুও মাধবী নিরুত্তর)

কুমার দত্ত ঃ আমি এত কথা বলা সত্ত্বেও তুমি কোনো কথাই বলছো না। তোমাকে আমি বলপূর্বক হরণ করে নিয়ে গেলেও কেউ তোমায় রক্ষা করতে আসবে না।

(এই কথা শোনার পর মাধবী উত্তর না দিয়ে পারলেন না।)

মাধবী ঃ তুমি মূর্খ ও কামান্ধ, তাই তুমি ভুলে গেছ তুমি কে আর আমিই বা কে ? পরস্ত্রীকে কামনা করলে তা কখনো শুভ হয় না। আমি একনিষ্ঠা

পতিপরায়না সতী ; আর তুমিও রাজপুত্র ; লোকে তোমার এই মানসিকতার কথা শুনলে বলবে, রাজার শ্যালক পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত ও কুৎসিত মনোভাবাপন্ন। লোকনিন্দা মানবজীবনকে নিষ্ফল করে। বিজয় সেনের রাজত্বে যে রাজ্যে একদিন সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না। রাজ দরবারে এই কথা উঠলে তুমি অবশ্যই দণ্ডিত হবে।

কুমারদত্ত ঃ হে সুন্দরী! তোমার কাঞ্চন বরণ দেহ রত্নভূষিত হয়ে রানীর জীবন যাপন করার উপযুক্ত, আমি তোমায় স্বর্ণালঙ্কারে সুশোভিত করে রাখব।

মাধবী ঃ রে পাপিষ্ঠ! গৃহে আমার শ্বশুর ও স্বামী বর্তমান। তাঁরা আমার জন্য প্রভূত অলঙ্কার তৈরী করে রেখেছেন। আমার অর্থেরও কোনো প্রয়োজন নেই। আমি নিজ পতিগৃহে সুখী।

(মাধবীর প্রস্থান)

পরে একদিন কুমারদত্ত মাধবীর বাড়ীতে গিয়ে নানা ধরণের কথায় প্রলুব্ধ করে তার স্বামী ও শ্বশুরকে স্বর্ণালঙ্কার গড়ার জন্য নিয়োগ করলেন ও তাঁদের দ্বিগুণ অর্থ দেবার প্রলোভন দেখালেন। মাধবী তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে এই কাজ নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না। পরে কুমার দত্ত মাধবীর স্বামী এবং শ্বশুরকে দিয়ে গড়ান অলঙ্কার ওজন করিয়ে সোনা কম দেবার মিথ্যা অপবাদে তাঁদের কারারুদ্ধ করালেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মাধবীর গৃহে একাকিনী মাধবী—কুমারদত্তের প্রবেশ)

কুমার দত্ত ঃ ওগো সুন্দরী! আমার কথা শোনো। তোমার স্বামী ও শ্বশুরকে আমি কারারুদ্ধ করেছি ; এখন তো একটু সময় দাও।

মাধবী ঃ তুমি নির্বোধ ও মূর্খ ; আমার স্বামীর অধিকার ও আমার সতীত্ব তাঁর উপস্থিতির উপর নির্ভর করেনা! মানুষের ধর্ম ও মূল্যবোধ হ'ল চিরন্তন। ভাল চাওতো আমার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাও নতুবা তোমাকে বদ চরিত্রের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে।

কুমার দত্ত ঃ ওগো আমার আদর্শবাদিনী সুন্দরী, আর শাশ্বত মূল্যবোধের কথা বলনা! আমরা ক্ষণস্থায়ী মরণশীল মানুষ, অচিরেই আমরা চিতাভস্মে পরিণত হব ; ধর্মবোধ আর মূল্যবোধ কি আমাদের জন্য? যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে পেতে চাই। রাজদণ্ডের ভয় আমার নেই!

মাধবী ঃ যদি রাষ্ট্রের আইন দুষ্টের দমন করতে না পারে, অবিচার ও

অত্যাচার যদি ন্যায় ও ধর্মের পথ ভ্রষ্ট করে ; তবে রাষ্ট্র রসাতলে যাবে। তার সঙ্গে তোমরাও বাদ যাবেনা।

কুমার দত্তঃ তোমার আশা মরিচীকা মাত্র। ধরণী আর বীরভোগ্যা নন, তিনি আজ তদ্বির-ভোগ্যা—বুঝেছ মাধবী! তাই যুগে যুগে চলেছে আমাদের মতন আত্মসাৎ কারীর দাপট, আমাদের বিনাশ নেই। ত্রেতাযুগে আমিই রাবণরূপে রামের সীতাকে অপহরণ করেছিলাম, কেড়েনিয়েছিলাম কুবেরের পুষ্পক রথ। দ্বাপরে আমিই দুর্যোধন ও দুঃশাসনের বেশে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলাম। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভাইদের পিতৃরাজ্য থেকে একেবারে দেশান্তরে ও অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলাম। তাই বলছি, আমার কথা শোন। ক্ষণস্থায়ী জীবনে যতটুকু পার উপভোগ করে নাও।

(এই কথা শুনে মাধবী তিক্ত স্বরে ঝাঁটা হাতে গৃহ থেকে তাকে বহিষ্কার করলেন)।

পুনরায় মাধবীর শ্বশুরের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে হঠাৎ আবার একদিন দিনের বেলায় মাধবীর ঘরে ঢুকে পড়লেন কুমার দত্ত। মাধবী তাড়াতাড়ি চলে যেতে গেলে তিনি তার আঁচল টেনে ধরলেন ও তাঁর বক্ষাবরণ উন্মোচনের চেষ্টা করলেন। মাধবী জোরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তার শ্বশুরকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর হাহাকার শব্দে চতুর্দিকের লোকজন সমবেত হয়ে কুমার দত্তকে বন্দী করে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে নিয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রীমহাশয়ের গৃহ—(কুমার দত্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনার পর)

মন্ত্রী মহাশয়ঃ (স্বগতোক্তি) কোনরকমে আমায় এদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। এরা ভেবেছে কি? এদের সঙ্গে গিয়ে এদের পক্ষে বলার জন্য রাজমহিষী বল্লভার কোপে পড়ি আরকি!

মন্ত্রী মহাশয়ঃ (ক্ষুব্ধ মাধবী ও প্রতিবেশীদের আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে) আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। কিন্তু এ রাজার শ্যালক, উপরন্তু রাজপত্নী বল্লভার ভ্রাতা, সেই হেতু আমি শাস্তি দিতে পারছিনা। কিন্তু শাস্তি এর হবে। তোমরা রাজসভায় যাও। আমি পিছনে আসছি।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজসভা

সকলে মাধবীকে সামনে রেখে রাজসভায় উপস্থিত হলেন এবং রাজাকে

বন্দনা করে বললেন—হে রাজন! আপনার পরিচালিত বঙ্গরাজ্যে কিছু ধর্ম-বিগর্হিত কার্য হচ্ছে। এর প্রতিকার চাই। ন্যায় বিচারের জন্য আমরা এই রাজসভায় সমবেত হয়েছি।

মাধবী: (ভূমিষ্ট হয়ে রাজাকে প্রণাম করে) আমি বণিকবধূ মাধবী। রাজশ্যালক কুমারদত্ত আমার গৃহে বলপূর্বক প্রবেশ করে আমার শালীনতাহানির চেষ্টা করেছেন। আমি আপনার কাছে এই লাঞ্ছনার যথোচিত বিচার চাই।

তখন গুরু গোবর্ধনাচার্য বললেন—তোমরা কি বলছো!

রাজমহিষী বল্লভা: এই কাজ আমার ভাই কুমার দত্ত করেনি। (উমাপতি ধরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে) করেছে ওই মন্ত্রী—উমাপতি ধর।

রাজমহিষীর মুখে এই কথা শুনে মন্ত্রী মৌন হয়ে থাকলেন। রাজা এবং সভাসদরাও মৌনতা অবলম্বন করলেন!

রাজমহিষী বল্লভা: (মাধবীর প্রতি) পাপিষ্ঠা! পরপুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে আমার ভাইয়ের প্রতি দোষারোপ করছিস!

তখন মাধবী রাজমহিষীর সম্মুখে ভূমিষ্ট হয়ে তাঁর পদবন্দনা করে বললেন:

মাধবী: হে রাজমহিষী, এই রাজ্যের রাজা গৌড় বিজয়ী মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন। আপনি তাঁর পত্নী। এই রাজ্যে এখনও ধর্ম আছে। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কেউ যা খুশি তাই করতে পারে না। তবে শক্তি থাকলেই যে যা খুশি তাই করতে পারে, এইরূপ ধর্মই যদি আপনার পিতৃগৃহে প্রচলিত থাকে—তাহলে বলুন, আমি আপনার ভাইয়ের ভজনা করি!

এই কথা শুনে রাজমহিষী মাধবীর চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে অপমান করলেন। ভয়ে সভাগৃহের একজনও এগিয়ে এলো না মাধবীকে রক্ষা করতে। তখন সভাস্থ সকলকে উদ্দেশ্য করে মাধবী বলল:

মাধবী: এ রাজ্যে কি সত্য কথা বলার সাহস নেই কারও? নির্যাতনের প্রতিবাদে এগিয়ে আসার শক্তি কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? রাজশক্তির পক্ষপাতে রাজশ্যালকদের পরস্ত্রী ও পরস্ব অপহরণ কি অব্যাহত থাকবে?

গোবর্ধনাচার্য: (স্বাগতোক্তি) অন্য সভাসদদের মতো আমিও কি কর্তব্য ভুলে গিয়ে শক্তিমানের তাঁবেদার হয়ে থাকব? পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যেরা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় প্রতিবাদ না করায় আজও নিন্দিত হয়ে থাকেন আমিও কি নিষ্ক্রিয় থেকে সেই রকম নিন্দা ও অপযশ আহরণ করব? না! আমি

বিবেকের দংশন অনুভব করছি। এই ঘোর অন্যায় এর প্রতিবাদ না করে নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি না। প্রতিবাদ আমায় করতেই হবে।

মন্ত্রী গোবর্ধনাচার্য : (উত্তেজিতভাবে আসন ত্যাগ করে) হে রাজন! আপনি জাগ্রত হন, আপনার রাজ্য শীঘ্রই ধ্বংস হবে। এই বলে ক্রুদ্ধ মন্ত্রী একটি খনিত্র হাতে নিয়ে রাজপত্নীকে প্রত্যাঘাত করতে গেলেন।

মন্ত্রী গোবর্ধনাচার্য : (রাজাকে উদ্দেশ্য করে) গর্বিতা মহিষী নিজে সব কিছু জেনেও অধর্মকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্রয়ে তাঁর ভ্রাতা একটি সতী নারীর সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। ওকে বিতাড়িত করুন নতুবা রাজ্য বিনষ্ট হবে। পূর্বে পাল বংশের রাজারা সৎ রাজা ছিলেন ও সত্য কথা শুনতেন। এমন কি—পাল বংশের রাজা রামপাল তাঁর একমাত্র পুত্রকে ধর্ষনের অপরাধে শূলে চড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার রাজ্যে ধর্মলোপ পেয়েছে—তাই আমি এরাজ্য ত্যাগ করছি :

এই কথা বলে গোবর্দ্ধনাচার্য দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে নিয়ে প্রস্থান উদ্যত হলে সভাস্থ সকলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

রাজা (স্বগতোক্তি) : আমি স্বজন তোষণ করে শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই রাণীকে খুশি রাখতে গিয়ে আমি আমার রাজসভার গুণী-জ্ঞানী আচার্যকে হারাতে বসেছি। প্রজাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যও পরে হারাতে হবে হয়তে না! আচার্যকে সে যেমন করে হোক ফেরাতেই হবে। কুমার দত্তকে ন্যায়-দণ্ড না দিলেই নয়! অতঃপর রাজা কুণ্ঠিতভাবে নিজে উঠে ব্রাহ্মণের পদবন্দনা করে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন ও খড়্গ হাতে নিয়ে কুমার দত্তকে হত্যা করতে ধাবিত হলেন। তখন মাধবী রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। (রাজাকে প্রণাম করে)

মাধবী : হে রাজন, আপনি অস্ত্রধারণ করাতেই আমার সতীত্বের অমর্যাদার প্রতিকার হয়েছে। এঁর হাত ধরাতে তো আমার প্রাণ যায়নি, আমার জাতও যায় নি। হয়তো কোন কর্মফল হেতু এই অঘটন ঘটেছে। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি এঁকে ক্ষমা করে দিন। সকলে শান্তিতে থাকুক।

অতঃপর মাধবী রাজসভা থেকে প্রস্থানকালে কাঁদতে কাঁদতে রাজা সভাসদবর্গ ও রাজগুরু গোবর্ধনাচার্যের উদ্দেশ্যে বললেন :

মাধবী : হে রাজন, হে রাজগুরু, সভাস্থ সকল জন শুনুন, যদি আমি অজ্ঞাতসারে কোন অন্যায় বা প্রগলভতা করে থাকি আপনারা নিজগুণে তা ক্ষমা করবেন।

সভাস্থ সকলে : সাধু! সাধু! [মাধবীর প্রতিবেশীসহ প্রস্থান]

॥ যবনিকা পতন ॥

পরিশিষ্ট—ঙ

সেন রাজ বংশের কর্ণাটক পর্ব

হিমাচলের সেনরাজারা এসেছিলেন বঙ্গদেশ থেকে এবং তাঁরা ছিলেন বঙ্গের সেনরাজাদের উত্তরপুরুষ। বঙ্গের সেনরাজারা আবার এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক দেশ থেকে—এ বিবরণটি পাওয়া যায় বঙ্গের রাজা বিজয় সেনের প্রশস্তি লিপিতে। বিজয় সেন দেওপাড়ার কাছে যে শিবমন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন সেই মন্দিরগাত্রের প্রশস্তির লিপিকার ছিলেন তাঁরই সভাকবি উমাপতি ধর। তিনি লিখে গেছেন 'দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র' বীরসেন ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষ।

"বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈ বীরসেন প্রভিতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।"

এই লেখে তাঁর সন তারিখ কিছু পাওয়া যায়নি। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের জীবনী রচয়িতা আনন্দভট্ট তাঁর 'বল্লাল চরিত'-এ উল্লেখ করেছেন এই বীর সেন মহাভারতখ্যাত কর্ণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এ থেকে মনে হয় বীর সেনের পূর্বপুরুষ অঙ্গদেশে বসবাস করতেন এবং সেখান থেকে তাঁরা দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ও কর্ণাটকে প্রতিষ্ঠিত হন।

বীরসেনের উত্তর পুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন সামন্ত সেন। কর্ণাটকে সামন্ত সেন তাঁর রাজ্য শাসন করতেন একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এই সময় বহিরাগত শত্রুরা কর্ণাটক লুঠ করতে এলে তিনি তাঁদের দমন ও মথন করেছিলেন, কিন্তু তাতে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসেনি, আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ লেগেই ছিল। এসবে উত্যক্ত হয়ে তিনি কর্ণাটক ত্যাগ করে বঙ্গদেশে এসে শেষ বয়সে ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করবার জন্য গঙ্গাতীরে বসবাস করেন।

"যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূণ্যোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্য পুণ্যাশ্রমাণি।"

কুলজী গ্রন্থ অনুযায়ী সামন্ত সেনের গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থাশ্রম নির্মাণ করতে সক্ষম হলেও তাঁর পুত্র হেমন্ত সেনের অধিকারে ছিল সুবর্ণরেখাতীরের কাশীপুরী যা বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার কাশীয়ারি (কেশিয়াড়ি) নামে পরিচিত। হেমন্ত সেন কেশিয়াড়ি দিয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসে পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন।

'বিপ্রকুল কল্পলতিকা' গ্রন্থের মতানুযায়ী দাক্ষিণাত্য-বৈদ্যরাজ অশ্বপতি সেনের বংশে চন্দ্রকেতু সেন জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর বংশে বীর সেন জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু কর্ণাটকের লিপি ও লেখ অনুসন্ধান করলে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত সেখানের সেন বংশের কিছু কিছু ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়।

কর্ণাটকে সেন রাজারা 'সেনবর' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের রাজ্য ছিল চিক্কামাগালুর জেলার 'চিক্কা' মাগালুর তালুক ও সিমোনা জেলার কোপ্পা তালুক জুড়ে। এই অঞ্চলে সম্প্রতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁদের রাজত্ব করার ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া গেছে। প্রথমে তাঁরা বিদ্যাধর লোকরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন এবং শিলহর রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল। ডঃ বার্নেট (Dr. Barnet) বলেন, এই সেন রাজাদের কুটুম্বিতা ছিল পন্নগধ্বজের সঙ্গে। তিনি ছিলেন খচর রাজ বংশসম্ভূত এবং কল্যানের চালুক্য রাজাদের অধীনস্থ মন্ত্রী বা সামন্ত রাজা (EI, XI-X).

সেনবরদের সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে অলুপ রাজ চিত্রবাহনের কিগ্‌গা লেখ (kigga inscription) থেকে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় সেন রাজারা কোপ্পা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, বাদামীর চালুক্যদের সম্বন্ধী ঔলুপ রাজাদের সামন্ত রাজা রূপে। খচর রাজবংশের রাজাদের প্রতীক ছিল সিংহ আর তাঁদের রথধ্বজে থাকত সর্প চিহ্ন। আমরা জানি যে, মহাভারতের যুদ্ধে কৌরবরা তাঁদের রথধ্বজে অনুরূপ সর্পচিহ্ন ব্যবহার করতেন বলে তাঁদের 'উরগ পতাকম্' বলা হত। সেন রাজারা উপাধি নিয়ে ছিলেন 'হেমকূট পুরাধিনাথ', 'কুডলুড়-পুর বরেশ্বর'। তাঁদের রাজধানীর সঠিক অবস্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি। অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের রাজধানী সম্ভবতঃ বসতরে হুবলীর তুডবল্লী হতে পারে। কিগ্‌গা লেখে আমরা সেনরাজা পৃথ্বীবল্লভ সেনবরের উল্লেখ পাই। তাঁর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক সেনরাজার নাম এখনও জানা যায় নি। ইনি ছিলেন চালুক্য রাজ বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রয়ের মাণ্ডলিক (Ec. VII, Sk 278)। যদিও এই লেখে কোন তারিখ দেওয়া নেই। রাইস মনে করেন' এই লেখ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লেখা।

পরবর্তী কালের অন্য একটি লেখে রাজা পৃথ্বীবল্লভ সেনের একজন উত্তর পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কল্যানের ইম্মাদি বিক্রমাদিত্যের সামন্তরাজা রূপে রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু লেখে তার নামটি ঘসে মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে (EC. VIII, Sb 381)।

সেন বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন জীবিতবর (জীবিতেশ্বর)-র পৌত্র মারসিংহ দেব। লেখ থেকে জানা যায় জীবিতবর একাদশ শতাব্দীর প্রথম

ভাগে রাজত্ব করতেন এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিতেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর শত্রুর হাতে নিহত হন (EC. VI, CM 91)। জীবিতেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জীমূত বাহন রাজত্ব করেন এবং তিনি বিত্ত-বল্লীতে মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করে, তিনটি গ্রাম সেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে দান করেন (EC. VI, CM 95)। মারসিংহদেবের পাঁচটি লেখে তাঁর ও সেন বংশের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

বিলম্বী সম্বৎসর (১০৫৮ খৃঃ)-এর লেখে রাজাকে মারসিংহ নাম উল্লেখ করা হয়েছে। একটি লেখ অনুসারে তিনি চিত্তবল্লী, মাণ্টাবুরা এবং চক্রবিত্তকা প্রভৃতিতে একাধিক মন্দির নির্মাণ করেছেন। অন্য একটি লেখ অনুযায়ী তিনি 'মানা-দেগুলা' নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং জনৈক চিক্কা জিয়াকে মথডপল্লী দান করেন। খাহ্বলির কদবন্তী গ্রামের লেখে উল্লেখ আছে যে, রাজা খচর কন্দর্প সেনবর জৈন মন্দিরের জন্য জনৈক জৈনকে ভূমি দান করেন। এজন্য কোন কোন গ্রন্থকার সেনবরদের জৈন ধর্মাবলম্বী মনে করেন। কিন্তু জৈন মন্দিরের জন্য এই ভূমিদান ছাড়া তাঁদের জৈন ধর্মাবলম্বনের অন্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। বরং কর্ণাটকের সেনবররা যে সব মন্দির নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে শিব মন্দিরের সংখ্যাই ছিল বেশী। ডঃ পি. গুরুরাজ ভট্ট মনে করেন যে, দক্ষিণে কন্নড় জেলার বৈন্দুর গ্রামে সেনেশ্বরের মন্দিরটিও সেন রাজারাই নির্মাণ করেছিলেন এবং বঙ্গদেশের সেনরাজাদের লেখ ইত্যাদি। উপাদান থেকে আমরা জানতে পারি যে সেন বংশের কুলদেবতা ছিলেন সদাশিব। একটি লেখ থেকে জানা যায় যে মারসিংহদেব তাঁর প্রপিতামহ জীবিতবরের হত্যাকারী শত্রুদের যুদ্ধে পরাজিত করে প্রপিতামহের স্বর্গত আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য প্রতিশোধ নেন। এইভাবে তিনি তাঁর শৌর্য বীর্য ও মহত্বের জন্য বিভিন্ন আখ্যা ও উপাধি পেয়েছিলেন যথা :—পদ্মাবতীচরনসরোজ ভৃঙ্গ, রণ-রঙ্গ-রাঘব, কালী-মত্তে-গণ্ডা বীরুদরঙ্কুশ প্রভৃতি। 'পদ্মাবতীচরণসরোজ ভৃঙ্গ' উপাধি পরবর্তীকালের বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের "পদ্মাবতীচরনচারন চক্রবর্তী"—বিশেষণটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি জয়দেব হয়ত মারসিংহদেব ও তাঁর রানী পদ্মাবতীর কথা জানতেন এবং মারসিংহদেবের উপাধির প্রভাবে নিজের বিশেষণটিও রচনা করেছিলেন। মারসিংহ সেনের রাজত্বের পরে কর্ণাটকে এই বংশের বা বংশোদ্ভূত কোন রাজার কীর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ মারসিংহ দেবের উত্তরাধিকারীরা, তাঁদের অধিরাজ চালুক্যেরা যখন একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে উত্তর ভারত অভিযান করেন, তখন তাঁদের বাহিনীর সঙ্গে সেনাপতিরূপে বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসক রূপে বঙ্গদেশেই থেকে যান। এইভাবে বঙ্গদেশে সেনবংশের সূচনা হয়।

বঙ্গদেশে সেনবংশের প্রথম রাজা সামন্ত সেনের নামে 'সামন্ত' কথাটি যদিও তাঁর নাম (Propername) হয়ে গেছে খুব সম্ভবতঃ এটি তাঁর পদমর্যাদার থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি চালুক্য রাজাদের সামন্তরূপে কর্ণাটক ও বঙ্গের কোন অঞ্চল শাসন করতেন। বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গাতীরের তীর্থ-ভূমিতে তিনি বসবাস শুরু করেছিলেন। তিনি 'রাজা' বা 'মহারাজা' এরূপ কোন উপাধি ধারণ করেননি। কিন্তু তাঁর পুত্র হেমন্তসেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করায় মনে হয় তিনি চালুক্য রাজাদের অধীনতাকে পাশ কাটিয়ে রাঢ়ে সেনবংশের স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করেছিলেন। হেমন্তসেন ও তাঁর পুত্র বিজয় সেন (১০৯৫—১১৫৮ খৃঃ) যখন রাজ্য জয়ে প্রবৃত্ত হন তখন সেই সব যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বীর যোদ্ধা ও অধিকৃত অঞ্চলসমূহ প্রশাসনের জন্য উপযুক্ত প্রশাসকের প্রয়োজন হওয়ায় তাঁরা কর্ণাটকের চিক্কামাগালুর ও কোপ্পা থেকে তাঁদের বিশ্বস্ত আত্মীয় সেনবংশীয়দের নিয়ে আসেন এবং এইসব পদে নিয়োগ করেন। এতগুলি যোদ্ধা ও প্রশাসক কর্ণাটক থেকে এক সঙ্গে বঙ্গদেশে চলে আসায় একাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে সেন বংশধরদের সম্বন্ধে কর্ণাটকের লেখ ও লিপিমালায় নীরবতা নেমে এল কিন্তু বঙ্গের লেখে তাঁদের কীর্তি কাহিনীর সোচ্চার বর্ণনা পাওয়া যেতে লাগলো। বঙ্গদেশে এসে এঁরা যে হেমন্তসেন ও বিজয়সেনের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন ও সাম্রাজ্যবিস্তারে সহায়ক হয়েছিলেন তার সত্যতা বঙ্গের বারাকপুর তাম্রশাসন ও দেওপাড়া লিপি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে কর্ণাটকে এইভাবে সেনবংশের সূর্য অস্তমিত হলেও পূর্বভারতের বঙ্গদেশে সেন বংশের নবারুণের পুনরভ্যুদয় দেখা গেল।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকদের জন্য কর্ণাটক সরকার প্রকাশিত 'কর্ণাটক পরম্পরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ডঃ সূর্যনাথ ইউ কামাথের 'সেনবর' শীর্ষক কন্নড় ভাষায় প্রবন্ধটিও নীচে সংযোজিত হ'ল। উল্লিখিত লেখ ও লিপিগুলিও দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট চ

বঙ্গদেশ ও হিমাচলের মতো কর্ণাটকের সেনরাজাদের ধারাবাহিক নাম এখনও পাওয়া যায়নি। তবুও যে কয়টি লেখ পাওয়া গেছে তার থেকে রাজাদের নাম আনুক্রমিক ভাবে কর্ণাটক পর্বে দেওয়া হল। হিমাচল প্রদেশে প্রাপ্ত সেনরাজ বংশাবলী কর্ণাটকের সেনরাজাদের এই পর্বের উপর তেমন আলোকপাত করে না। এই বিষয়ে গবেষণারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাহলেও কর্ণাটকের লেখগুলির মতো পাথুরে প্রমাণকে অস্বীকার করা যায় না। তাই কর্ণাটকের সেন রাজাদের ধারাবাহিক নাম এখনও না পাওয়া গেলেও, যে কয়টি নাম উল্লিখিত হল সেগুলি প্রামাণ্য লেখের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

কর্ণাটক পর্ব

বীর সেন : দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিতে দাক্ষিণাত্যের সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর সেনের উল্লেখ পাই 'দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র'* ও সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে। কিন্তু তাঁর রাজত্বের কাল বা অব্যবহিত পরবর্তী পুরুষদের কোন বিবরণ নেই এই লিপিতে।

↓

পৃথ্বিবল্লভ সেনবর : খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী

↓

জীবিতবর : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

↓

জীমূতবাহন (ঐ পুত্র) :

↓

মারসিংহদেব (ঐ পুত্র) : একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

↓

কন্দর্প সেনবর : আঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ

---

* বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

বঙ্গপর্ব

সামন্ত সেন : কর্ণাটরাজ সামন্ত সেন শত্রুপূর্ণ ও কলহলিপ্ত কর্ণাটদেশ ত্যাগ করে বৃদ্ধ বয়সে শান্তির সন্ধানে বঙ্গ দেশে গঙ্গা-তীরে এসে বসবাস করেন।

↓

হেমন্ত সেন : ১০৪৫—১০৭৯ খৃঃ (রাজত্বকাল)

↓

বিজয় সেন : ১০২৯—১১১৯ খৃঃ :—বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলজীমতে বিজয় সেনের জন্ম ৯৫১ শাকে। সম্বন্ধতত্ত্বার্ণবেও লিখিত আছে তাঁর জন্ম ঐ ৯৫১ শকাব্দেই, অর্থাৎ ১০২৯ খৃষ্টাব্দে। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী মতে তিনি চৌত্রিশ বছর রাজত্ব করেন ("পালয়ৎ অব্দং চতুস্ত্রিংশ সমাঃ ক্ষমাম্।") ১০৪১ শকাব্দে ৯০ বছর বয়সে বিজয় সেনের মৃত্যু হয়। কিন্তু নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস'-এর রাজবৃত্তে বিজয় সেনের আনুমানিক রাজত্বকাল নির্দেশ করেছেন ১০৯৫—১১৫৮ খৃঃ। পিতা হেমন্ত সেনের মৃত্যুকাল এবং পুত্র বল্লাল সেনের সিংহাসনে আরোহণকাল বিবেচনা করে এখানে বিজয় সেনের উল্লিখিত সময় নির্ধারিত হয়েছে, যদিও ক্ষেত্র-বিশেষে মতান্তরও আমরা উল্লেখ করেছি।

বল্লাল সেন : ১১১৯—১১৬৯ খৃঃ-বৈদিক ব্রাহ্মণদের কুলজী অনুযায়ী ত্রিবিক্রম মহারাজ বিজয় সেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামল সেনকে বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে বল্লাল সেন সিংহাসেন আরোহণ করেন। শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁর 'গৌড় কাহিনী' (১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩০৬)-তে এই মতের উল্লেখ করেছেন।

'দানসাগর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে "পূর্ণেশশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরঃ রচিতঃ।" অর্থাৎ বল্লাল সেন 'দানসাগর' গ্রন্থ রচনা করেন ১০৯০+৭৮=১১৬৮

; তারপর তিনি 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাভিষেকে তিনি ব্যস্ত থাকায় এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এই গ্রন্থ সমাপ্তির ভার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উপর অর্পণ করে তিনি সস্ত্রীক (ত্রিবেণীতে?) গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার পরিচিতিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"গ্রন্থেহস্মিন্নসমাপ্ত এবং তনয়ং সাম্রাজ্যরক্ষামহা
দীক্ষাপর্ব্বনি দীক্ষাণান্নিজকৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্চ্চ্যসঃ।

প্রবাদ আছে যে তন্ত্র সাধনার উদ্দেশ্যে ডোমকন্যাকে সাধনসঙ্গিনী করার ফলে যখন বল্লালের বিরুদ্ধে লোকাপবাদ ব্যাপ্ত হয়, লক্ষ্মণ সেন তখন পিতাকে নিরত করবার অভিপ্রায়ে কতিপয় শ্লোক রচনা করেছিলেন। বল্লাল সেনও দোষস্খলনের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব শ্লোকের প্রত্যুত্তর শ্লোকের মাধ্যমেই দিয়েছিলেন।*

লক্ষ্মণের উক্তি : শৈত্যং নামগুণস্তবৈবসহজঃ স্বাভাবিকীস্বচ্ছতা
কিংব্রূমঃ শুচিতাংভবন্তিশুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে
কিঞ্চান্যৎ কথায়ামি তেস্তুতি পদংত্বং জীবিনাংজীবনং
ত্বংচেৎ নীচপক্ষেণ গচ্ছসি পয়ঃ কস্তানিরোদ্ধুংক্ষমঃ।

বল্লাল সেনের উক্তি : তাপো নাবসিতস্তৃষনচকৃশা ধূলির্নধূতস্তনৌ
ন স্বচ্ছন্দমকরিকন্দকবলং কা নামকেলি কথা
দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হস্ত করিণাস্পৃষ্টান বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো স্বচ্ছন্দকোলাহলঃ।

লক্ষ্মণ সেনের উক্তি : পরীবাদস্তথ্যঃ ভবতিবিতথোবাপিমহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নাংহরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রথর মহসা শেষ তমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজঃ নহিভবতি কন্যাং গতবতঃ

বল্লাল সেনের উক্তি : সুধাশোর্জাতেয়ং কথমপিহিকলঙ্কস্তকণিকা
বিধাতুর্দোষোহয়ং নহিভবতি শশাঙ্কস্তকিমপি

* উপরের শ্লোকগুলির জন্য গ্রন্থকার পণ্ডিত নলিনীকান্ত মিশ্রের নিকট ঋণী।

না কিং নাত্রেপুত্রঃ নকিমুহরচুরার্চ্চনমনিং
ন বা যস্তিধাস্তং ন কিমুবিমলানন্দজনকঃ

লক্ষ্মণ সেন : ১১৬৯—১২০৬ খৃঃ (মতান্তরে ১১৭৯—১২০৬ রাজত্ব-কাল—মীনহাজ-উশ-সিরাজ-এঁর তবকাৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে লক্ষ্মণসেন যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁর মাতাও তাঁর ভূমিষ্ট হবার পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এ জন্য লক্ষ্মণ সেনকে জন্মের পরই রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয় ও ঐ বৎসর থেকেই লক্ষ্মণসেন সম্বৎ গণনা করা হয়। এইভাবে লক্ষ্মণসেন সম্বতের সূচনা হয় ১১১৯ খৃষ্টাব্দে। বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন আঃ ১২০১ খৃষ্টাব্দে। তাই ঐ সময় লক্ষ্মণ সেনের বয়স হয়েছিল (১২০১—১১১৯)=৮৩ অর্থাৎ আশি বছর।

'লঘুভারত' গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লালসেন যখন মিথিলায় যুদ্ধরত ছিলেন সেই সময় লোকমুখে শোনা যায় যে, বল্লাল সেন যুদ্ধে মারা গেছেন। এমন সময় লক্ষণসেন ভূমিষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এই গুজব রটার জন্য লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুরের সিংহাসনে বসান হয়। অতএব মিথিলায় বল্লালসেনই পুত্রের জন্ম সংবাদ পেয়ে ঐ বৎসর লক্ষণসেন সম্বৎ চালু করেন।

** লঘুভারতে প্রাপ্ত শ্লোকটি নীচে উল্লিখিত হল।

লক্ষ্মণসেন ও বল্লালসেনের বাদ প্রতিবাদের শ্লোকগুলিও সূচনা দেয় যে বল্লালের জীবনকালেই লক্ষ্মণ সেন স্বাধীনমত ব্যক্ত করে কবিতা লেখার মতো বয়ঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। লক্ষ্মণ সেন আঃ ১২০৫ অথবা ১২০৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

** প্রবাদ : শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীন বার্ত্তয়া
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালোভূন্মৃতধ্বনিঃ।
তদানীং বিক্রমপুর লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।

মাধব সেন (আঃ ১২০৫-১২১৫ খৃঃ) : লক্ষ্মণ সেনের পর মাধব সেন রাজা হ'ন। অল্পকাল পরে তিনি ভাই কেশব সেনকে রাজ্য দিয়ে হিমালয়ে চলে যান। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেশ্বর মন্দিরের গায়ে শিলালিপিতে মাধব সেনের কীর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

কেশব সেন (আঃ ১২২০-১২৩৩ খৃঃ) : কেশব সেন আনুমানিক ১২১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তারপর মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করে নেওয়ায় কেশব সেন বিক্রমপুরে চলে যান। তিনি একজন সুকবি ছিলেন।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ মাধব সেন ও কেশব সেনের কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। 'আইন-ই-আকবরী' মতে মাধব সেন দশবছর ও কেশব সেন (কষমু সেন) পনের বছর রাজত্ব করেন। অর্থাৎ কেশব সেনের রাজত্বকাল শেষ হয় ১২৩০ বা ৩১ খৃষ্টাব্দে। এরপর রাজা হন বিশ্বরূপ সেন।

বিশ্বরূপ সেন : বিশ্বরূপ সেন লক্ষ্মণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বসুদেবীর গর্ভজাত। বিশ্বরূপ সেন তাঁর পুর্বোক্ত দুই ভায়ের অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী ছিলেন।

সূর্য সেন : বিশ্বরূপ সেনের 'মধ্যপাড়া লিপি' থেকে কুমার সূর্য সেন ও কুমার পুরুষোত্তম সেন নামে দু'জন রাজকুমারের নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক মনমোহনের বিবরণ অনুযায়ী কুমার সূর্য সেন বঙ্গ দেশ থেকে প্রয়াগে চলে আসেন এবং সেখানে তাঁর গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। দেশে যখন সেন-বংশের আসন্ন সঙ্কট, নবদ্বীপ ও গৌড় যখন পতনোন্মুখ এবং লক্ষ্মণ সেনের বহুপুত্রের (মাধব সেন, কেশব সেন, বিশ্বরূপ সেন) বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন সিংহাসন লাভ ছিল সুদূর পরাহত; সেই সময় আশাহত কুমার সুর সেন (সূর্য সেন) প্রয়াগে প্রস্থান করেন ভাগ্যান্বেষণে এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন কিছুদিন অবস্থানের পর।

রূপ সেন : সূর্য সেনের পুত্র রূপ সেন প্রয়াগ ত্যাগ করে পাঞ্জাবের শিবালিক অঞ্চলে এসে রূপনগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে ১২৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হ'ন।

সুকেত পর্ব

হরিয়ানার লোকসংস্কৃতি সংস্থানের গ্রন্থাগারে একটি সংস্কৃত বংশপরম্পরা রক্ষিত আছে। তার প্রতিলিপি (জেরক্সকপি) পাঠাতে অঙ্গীকার করেছিলেম শ্রীচন্দ্রমণি কাশ্যপ ও তাঁর মাতুল অধ্যক্ষ নীলমণি উপাধ্যায়। কিন্তু তা আজও না পৌঁছানোর জন্য তার সঙ্গে এই সন-তারিখ মেলানোর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হ'ল না। এটি পেলে পরবর্ত্তী সংস্করণে পর্যালোচিত হবে।

এছাড়া মাণ্ডীর অবসর প্রাপ্ত অ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কাশ্মীর সিংজীর কাছ থেকেও একটি বংশাবলী পাওয়া গেছে। এটি তিনি সেন বংশের বর্তমান উত্তর-পুরুষ রাজা অশোক পাল সেনের অনুরোধে লেখককে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। রাজন্যবর্গের পরম্পরা ও সন-তারিখ নিধারণে এই পুঁথিটির তথ্যের আলোচনাও করা হয়েছে। কানোয়ার কাশ্মীর সিংজী সেন রাজ-বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও মাণ্ডী স্টেটে কর্মরত ছিলেন। তাই তাঁর কাছে মাণ্ডী স্টেট ও রাজবংশের নির্ভরযোগ্য নথিপত্র থেকে গেছে। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত বংশাবলীর প্রারম্ভে লেখক সন্তসিং, (যিনি স্বয়ং সেন রাজবংশেরই একজন

১। কেওনথল : বর্তমান সিমলা জেলার জুঙ্গা তহসিল (মহকুমা)

২। সুকেত : বর্তমান নাম সুন্দর নগর। মাণ্ডী জেলার একটি মহকুমা।

৩। কিসতোয়ার : বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ডোডা জেলার তহসিল (মহকুমা)।

রাজ পুরুষ) লিখেছেন যে, এই বংশাবলী প্রথমে টাঁকরি হরফে লেখাছিল, যা তিনি দেবনাগরী হরপে লিখেছেন ২০০৩ সংবতে, অর্থাৎ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে, ফাল্গুনের (চান্দ্রমাস) ১২ তারিখে। সন্তসিং লিখেছেন সেনেরা ছিলেন চন্দ্রবংশী এবং অত্রি গোত্রীয় সামবেদী এবং মাধ্যন্দিনী শাখার ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সন্ত সিং চন্দ্রদেব থেকে শুরু করে মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত ক্রমানুযায়ী বংশধারার বর্ণনা করেছেন। এ অংশটি সম্ভবতঃ বংশ গৌরবের জন্যই পুরাণের অনুসরণে লেখা—কেননা কোন পাথুরে প্রমাণ এর পাওয়া যায়নি। এই পৌরাণিক অংশের পরে প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ রানা বিক্রম সেন সম্বন্ধে সন্তসিং লিখেছেন : বিক্রম সেন ১০৬১ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হলেন এবং তাঁর পুত্র ধরতারি সেন ঐ সনেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বঙ্গের লক্ষ্মণ সেনের ঐ উত্তর পুরুষদের হিমাচলে রাজত্বকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে হতে পারে না। কেননা আঃ ১১৯৯ বা ১২০১ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করার পর লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ ছেড়ে যান। সেই সময় অথবা তার পরই তাঁর পৌত্র সুর সেনের পশ্চিমে অপসরণ সম্ভব। আমাদের মনে হয়, বিক্রম সেনের মৃত্যু ১০৬১ সন ধার্য্য করায় তিনি ভুল করেছেন প্রায় দুশ'দুই বছরের মতো। বিক্রম সেনের মৃত্যু আঃ ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে ঘটেছে। অন্য বংশবলীর ভিত্তিতে মনমোহনের এই মতকেই আমরা সঙ্গত মনে করি। কিন্তু সন্তসিং এর বংশাবলীতে দেওয়া রাজাদের পারম্পরিক ব্যবধান ও রাজত্বকাল অধ্যাপক মনমোহন ও পাঞ্জাব গেজেটিয়ারের দেওয়া তথ্যের বিভিন্ন অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। তাই এই বংশাবলীর গুরুত্বও কিছু কম নয়। পূর্বালোচিত ২০২ বছরের ভুল সংশোধন করে রাজাদের পারম্পরিক ব্যবধান ও রাজত্বকাল সন্ত সিং এবং অধ্যাপক

মনমোহনের তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সাহু সেন (সাহু সেন) বা সাধু সেন পর্যন্ত রাজাদের কাল নির্ণয় করে নিয়ে প্রদত্ত হয়েছে। বাহু সেনের বংশধরদের ১১ জন রাজার বিবরণ প্রথম খণ্ডে দেওয়া হল। অকাল মৃত্যুজনিত কারণে এই রাজবংশধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। এই বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত শেষ উত্তরাধিকারী লিয়ান ফিয়ানকে রাজপদের অযোগ্য মনে করে প্রজারা তাঁদের মধ্যে থেকে মিঞা মদনকে রাজা মনোনীত করেন। মিঞা মদন, মদন সেন নাম নিয়ে সেন সিংহাসনে বসেন। প্রথম খণ্ডে মাণ্ডীর এই রাজধারার আলোচনা করা হয়েছে। বাহু সেনের ভাই আহুসেন বা সাহুসেন (সাধু সেন)-র বংশধরদের যথা নিমি সেন থেকে আজমের বা আজবর সেন পর্যন্ত সপ্তদশ রাজন্যবর্গের অনুক্রম ও আনুমানিক সন ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হল। যাতে সেনবংশের ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যাবে। (দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা হবে।)

বিশ্বরূপ সেনের রাজত্বে চতুর্দশ বৎসরে রাজকুমার সূর্য সেন তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভূমি দান করেছিলেন, তার লেখ-প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যপাড়া তাম্রলিপিতে। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে সেন রাজধানীর কাছাকাছি মধ্যপাড়া গ্রামে পাওয়া এই লিপিতে প্রদত্ত আনুমানিক কাল ১২২১ খৃষ্টাব্দ। সূর্য সেন সে সময়ে সেন রাজধানী জয়স্কন্ধাবারে (বিক্রমপুরে) অবস্থান করছিলেন, এ সিদ্ধান্ত করা সমীচিন। তাহলে ১২২১ খৃষ্টাব্দের পরই তিনি প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন এবং তারপরে তাঁর পুত্র রূপ সেন পাঞ্জাবের রোপারে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁর রূপনগর রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হন ; অধ্যাপক মনমোহনের ১২১৪ খৃষ্টাব্দে এই কাল নির্দেশ ঘটনাক্রম ও কালক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। বিক্রমপুর থেকে সূর্য সেনের প্রয়াগে এসে বসতি স্থাপন করা এবং সেখানে গঙ্গাতীরে মৃত্যুবরণ করার সময়কাল কমপক্ষে চার বৎসর ধরা সঙ্গত

হবে। প্রয়াগ থেকে তাঁর পুত্র রূপ সেনের রোপাড়ে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করতে কমপক্ষে আরও অন্ততঃ আট বছর লাগা স্বাভাবিক।

মধ্যপাড়া লিপি লেখার সময় থেকে রূপনগর রাজ্যের পতন পর্যন্ত অন্ততঃ আনুমানিক বারো বছর সময় ব্যয়িত হয়েছিল মনে হয়। তাই রূপনগরের পতন ১২১০ খৃষ্টাব্দের পরিবর্তে আনুমানিক ১২৩২ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল—এই সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এইভাবে রূপ সেনের পুত্র বীর সেনের সুকেতে গিয়ে রাজ্যাধিকারের সময়-কাল আনুমানিক ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে নিধারণ করা যেতে পারে। সেজন্য মনমোহনের নির্দেশিত কাল ১২১১ খৃষ্টাব্দের পরিবর্তে বীর সেনের সুকেতে আগমনের কাল আরও ২২ বছর পিছিয়ে কমপক্ষে ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ধারণ করা সমীচীন হবে।

সেন রাজবংশাবলী

বীর সেন : ১২৩৩—১২৬৮ খৃঃ—দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বীর সেন যেমন দাক্ষিণাত্যে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, রূপ সেন-পুত্র বীর সেনও তেমনই হিমাচলে সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি শতদ্রু নদীর উৎস পথের দিকে এগিয়ে 'জিকরি' নামক জায়গায় নদী পার হলেন এবং তারপর এগিয়ে গেলেন আরও উত্তরে কুনধার পাহাড় এলাকায়। সেখান থেকে আরও কিছু দূর এগিয়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন পাঙ্গোনাতে। সেইজন্য সেন বংশের তিনি 'দ্বিতীয় বীর সেন' হলেও লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষ যাঁরা হিমাচলে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি শুধু 'বীর সেন' নামেই পরিচিত হচ্ছেন আজও। তাঁর বংশের একটি শাখার রাজাদের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যথা :—

ধীর সেন (১২৬৮—১২৭৫ খৃষ্টাব্দ), বিক্রম সেন (১২৭৫—১২৮৩ খৃঃ), ধরিত্রী সেন (স্বল্পকাল) চন্দর সেন (১২৮৪ খৃঃ ?), খড়্গ সেন (স্বল্পকাল), লক্ষ্মণ সেন ২য় (১২৮৩—১৩০৮ খৃঃ), বিজয় সেন (১৩০৮—১৩১৮ খৃঃ), সাহু সেন (১৩১৮—১৩২৯ খৃঃ), রতন সেন, শ্রীমন্ত সেন পরবর্তী পাঁচজন রাজা (নামের

কথা উল্লেখ নাই) লিয়ান ফিয়ান প্রভৃতির কথা। প্রজাসাধারণ রাজবংশীয় লিয়ান ফিয়ানকে অযোগ্য মনে করে সাধারন মিলমালিক মিঞা মদনকে রাজা নির্বাচন করেন। এই বংশধারার আলোচনা প্রথমখণ্ডে এখানে সমাপ্ত করা হয়েছে।

বীরসেনের বংশের দ্বিতীয় শাখার রাজাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হল নীচে।

বীরসেনের বংশের (আহুসেনের পরবর্তী) দ্বিতীয় শাখা

নিমি সেন : আঃ ১৩৬০ খৃঃ—১৩৬৪ খৃঃ

(বাহুসেনের পুত্র)

নরবাহন সেন : আঃ ১৩৬৪ খৃঃ—১৩৭১ খৃঃ

কহবত্ সেন : আঃ ১৩৭১ খৃঃ—১৩৭৯ খৃঃ

সুবাহু সেন : আঃ ১৩৭৯ খৃঃ—১৩৮৪ খৃঃ

বীর সেন ৩য় : আঃ ১৩৮৪ খৃঃ—১৩৮৮ খৃঃ

সমুদ্র সেন : আঃ ১৩৮৮ খৃঃ—১৩৯৪ খৃঃ

কেশব সেন : আঃ ১৩৯৪ খৃঃ—১৪০৪ খৃঃ

মঙ্গল সেন : আঃ ১৪০৪ খৃঃ—১৪১৩ খৃঃ

(নরবাহন সেনের পুত্র)

জয় সেন আঃ ১৪১৩ খৃঃ—১৪১৭ খৃঃ

কাঞ্চণ সেন আঃ ১৪১৭ খৃঃ—১৪২৭ খৃঃ

বন সেন আঃ ১৪৭৪ খৃঃ—১৫০১ খৃঃ

কল্যান সেন আঃ ১৫০১ খৃঃ—১৫৪২ খৃঃ

হীরা সেন আঃ ১৫৪২ খৃঃ—১৫৫০ খৃঃ

ধরতারি সেন আঃ ১৫৫০ খৃঃ—১৫৬৮ খৃঃ

নরিন্দর সেন আঃ ১৫৬৮ খৃঃ—১৫৮০ খৃঃ

হরজয় সেন আঃ ১৫৮০ খৃঃ—১৬১২ খৃঃ

দিলবর সেন আঃ ১৬১২ খৃঃ—১৬৫৪ খৃঃ

আজবর (আজমীর) সেন আঃ ১৬৫৪ খৃঃ—১৬৮৯ খৃঃ

নিমিসেন—কেশবসেন :

১৩৬০ খৃষ্টাব্দে আহু (সাধু) সেন বা সাহু সেনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমি সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিমি সেনের প্রয়াণের পর ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নরবাহন সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৭১ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এরপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুবাহু সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হলে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাকা বীর সেন (৩য়) রাজা হন; মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র সমুদ্র সেন ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ছয় বছর রাজত্ব করার পর তিনি প্রয়াত হলে তাঁর পুত্র কেশব সেন রাজা হলেন। তিনি দশ বছর রাজত্ব করে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। কেশব সেনের কোন সন্তানাদি না থাকায় পিতৃব্য মঙ্গল সেন ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি ৬৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন। সম্ভবতঃ তিনি ১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

মঙ্গল সেন (১৪০৪—১৪১৩ খৃঃ) : মঙ্গল সেন ছিলেন নৃশংস প্রকৃতির। তিনি চাইতেন ভোজনকালে তাঁর নিজস্ব শিকারীদের দ্বারা নিহত পশুমাংস পরিবেশিত হবে। একবার খুব বৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রতিপালিত শিকারীরা কোন শিকারই ধরতে সমর্থ না হলে তিনি সেই মুষলধার বৃষ্টির মধ্যেই তাঁদের শিকারে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। এতে তাঁরা একটি কূট পরিকল্পনা করেন। একটি পরিত্যক্ত মৃত মানুষের মাংস কেটে সূপকারকে রন্ধনের জন্য দেন। রাণাকে সেই মাংস পরিবেশন করা হয়। শোনা যায়, তিনি নাকি সেই নরমাংসের স্বাদ খুব উপভোগ করেছিলেন এবং প্রশ্ন করে জেনে ছিলেন, তা কিসের মাংস। তখন তাঁর ধর্ম বিশ্বাস থেকে তিনি একশত এক দিন নরমাংস ভক্ষণের জন্য সংকল্প করেন, যাতে তিনি অবধূত হতে পারেন। কিছুদিন এই রকম চলার পর তাঁর বীতশ্রদ্ধ অনুচরেরা পরিকল্পনা করলেন—তাঁর এই নৃশংস ভোজ সমাপ্ত করবার জন্য।

রাজা প্রথা চালু করেছিলেন যে, রাজা স্বয়ং লোক-লস্কর নিয়ে বনে যাবেন। তখন পথে যার মাথায় চিড় গাছ থেকে ফল পড়বে, তাকেই বধ করা হবে এবং তার মাংস দিয়ে রাজার ভোজ্য তৈরী হবে। এই রীতিকে অনুসরণ করে এবার তাঁর লোকেরা ঠিক করলো, একজন

গাছের উপর নিজেকে আড়াল রেখে রাজার মাথায় ফলটি ফেলবে এবং ব্যবস্থা অনুসারে রাজাকেই বধ করা হবে; হ'লও তাই।

জয় সেন : (১৪১৩—১৪১৭ খৃঃ)

মঙ্গল সেনের মৃত্যুর পর জয় সেন ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয় সেন মাত্র দুই বছর রাজত্ব করে ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান। জয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কাঞ্চন সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কাঞ্চন সেন : (১৪১৭—১৪২৭ খৃঃ)

কাঞ্চন সেন রাজা হলেন ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে। পুর্বের রাজারা একজন বড় ভূস্বামীর অধীনস্থ স্বত্বভোগী রাণা ছিলেন মাত্র এবং সম্ভবতঃ সেই ভূস্বামীই ছিলেন কুলুর রাজা। কিন্তু কাঞ্চন সেন ক্ষমতাহীন সেই অধীনতাকে মানতে চাননি। তিনি কুলুর রাজাকে অস্বীকার করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের রাণাকে আক্রমণ করে পরাজিত ও হত্যা করেন। এই ভাবে থুজরি এবং কাও অধিকার করেন। এরপর প্রতিবেশী বাগি, থচ, নেরু এবং বন এর রাণাদের আক্রমন করলে তাঁরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন ও তাঁকে কর দিতে অঙ্গীকার করেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সার্বভৌম রাজার কাছেও অনুযোগ করলেন তাঁদের মুক্তির জন্য। কুলুরাজ অচিরেই বেয়াদব সামন্তরাজকে বন্দী করতে অভিযান সংগঠিত করলেন এবং কাঞ্চন সেন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন আনুমানিক ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে।

রাণা কাঞ্চন সেনের পত্নী সেই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। যখন ম্যাঙ্গালোর জলছিল তখন তাঁর পত্নী ব্রাহ্মণ রমণীর বেশে তাঁর পিতা শেওকত-এর রাণার কাছে পালিয়ে যান। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছবার আগে তিনি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং পরিশ্রান্ত হয়ে একটি বন গাছের তলায় আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। প্রভাতে

তিনি তাঁর পিতার রাজ্যের কিছু প্রজার সাক্ষাৎ পান। তাঁরা তাঁকে পিত্রালয়ে পৌছিয়ে দেন। পুত্র সন্তান হীন শেওকতের রাণা কন্যার সন্তানটিকে প্রতিপালনের ভার নিলেন এবং যে বৃক্ষের তলায় শিশুটি জন্মেছিল, সেই বৃক্ষের নামানুসারে শিশুটির নাম রাখলেন 'বন'। রাণার অভিভাবকত্বে ও প্রশিক্ষণের বন্দোবস্তে বনসেন একজন সাহসী ও সুদেহী যোদ্ধায় পরিণত হলেন।

বনসেন
(১৪৭৪—১৫০১ খৃঃ)

ঃ রাণার মৃত্যুর পর বনসেন সিংহাসনে আরোহণ করলেন ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর সিংহাসনলাভকে প্রয়াত রাণার মন্ত্রী বিস্ত মেনে নিতে পারেন নি। সম্ভবতঃ তাঁর পছন্দের কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। বনসেন তাঁকে হত্যা করেন ও দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। বনসেন প্রতিবেশী সকল রাজাকে পরাস্ত করে ক্ষমতার শীর্ষে পৌছে সাগরের রাণার রাজ্য আক্রমণ করলে রাণাসহ পরিবারের সকলে নিহত হলেন। কিন্তু একটিমাত্র শিশু জীবিত ছিল, সে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে পালিত হতে থাকে। এই শিশু সাবালক হলে রাণা বন সেন তার পরিচয় পেয়ে যান এবং তাঁকে রাজসভায় উপস্থিত করতে আদেশ দেন। কিন্তু তাকে 'ভাগোড়া' (পলাতক) বলে পরিহাস করে মুক্তি দেন। সাগর রাজ্য বনসেনের 'রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বনসেন কেন্টিরাজ্য আক্রমণ করেন। কেন্টি অধিকৃত হয়। বর্তমান কাঙ্কীশহর থেকে দু'মাইল দূরত্বে সেও থেকে তিউনিতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এরপর তিনি বিপাশা নদীর অপর পারে শাভল, পাণ্ডা, আর্কনি, খোখন ও দোধন রাজ্যের রাণাদের বশে আনতে মনস্থ করেন কিন্তু বিপাশা পার হওয়া তাঁর কাছে দুরূহ মনে হয়েছিল। তীরবর্তী বতীসেরা রাণার অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। পরস্পর দুই সৈন্য শিবির যখন মুখোমুখি, তখন বতীসেরা সেন রাজাকে জিতিয়ে দেবার

জন্য একটি কৌশল করলেন। বন সেনের শত্রুপক্ষের বাহিনী এত অতন্দ্র ছিল যে তারা একমাত্র আহারাদির সময় ছাড়া সর্বদা অস্ত্রসজ্জিত থাকতো। একদিন শত্রুবাহিনী যখন অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখেছে তখন এই বতীসরা রান্নার অছিলায় ধূম্রজাল বিস্তার করেছিলন, যারফলে শত্রুপক্ষের নজরকে ফাঁকি দিয়ে বন সেনের সৈন্যরা অভিযান চালাতে সক্ষম হন। শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করলে রাজা বন সেন তাঁদের রাজ্য অধিকার করলেন। বতীসদের এই সাহায্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য বনসেন 'লড়মার' উপাধি দিয়ে তাঁদের স্বীকৃতি দেন।

মাণ্ডী থেকে ২০ মাইল দূরে পরাশর হ্রদের কাছে পরাশর মন্দিরটি বন সেন নির্মাণ করেছিলেন। ভাসমান দ্বীপে এই মন্দিরটি অচিরেই একটি জনপ্রিয় বিহারে পরিণত হয় এবং প্রতি বছর জুন মাসে মেলার সময় এখানে বহু লোক সমাগম হয়ে থাকে। দীর্ঘ ৪৫ বছর রাজত্ব করার পর বন সেন ১৫০১ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

কল্যাণ সেন (১৫০১—১৫৪২ খৃঃ) : বন সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কল্যাণ সেন পুরাতন মাণ্ডী ক্রয় করেন এবং সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে প্রায় দেড়শ' বছর মাণ্ডী রাজধানীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বন সেনের রাজ্য বিস্তার তাঁর উত্তরপুরুষদের শক্তিশালী করেছিল। কল্যাণ সেন পিতাকে অনুসরণ করেই 'কেলটী' 'চটী' 'সময়' ও 'সাগ্রু'র রাজাদের দমন করেছিলেন। শেষোক্ত দুইরাজ্য তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কল্যাণ সেন একজন উদারনৈতিক রাজা ছিলেন, যোদ্ধা নন। সম্ভবতঃ তিনি ৪১ বছর অর্থাৎ আঃ ১৫৪২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হীরা সেন (১৫৪২—১৫৬০ খৃঃ) : কল্যাণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হীরা সেন রাজা হন আঃ ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে। চারণেরা মহান বিজেতা বলে তাঁকে বর্ণনা করলেও তিনি কেবলমাত্র কানোওলকেই

তাঁর রাজ্যের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভাই ধাত্রীসেনের সাহায্যে তিনি গান্ধারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

হীরা সেন সিংহাসনে আরোহন করেই রামতুলা, গন্ধর্ব ও রুকলেগরের রাণাদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। কীর্তিরাধার রাণার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। রাণা একদিন হীরা সেনকে ভোজনে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ভোজন সাঙ্গ করে রাণা যখন তাঁর সঙ্গে দুর্গপ্রাচীরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, অন্যমনস্কতায় হস্ত সঞ্চালনের জন্য দুর্গপ্রাচীরে হীরা সেনের প্রসারিত হাত স্পর্শ করায় রাণার সন্দেহ হয়, তিনি বুঝি দুর্গপ্রাচীরের প্রস্থ মাপছেন। এই সন্দেহবশতঃ তিনি উপদেষ্টামণ্ডলী ও মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপৎকালে বিধবা কন্যা ও বিধবা পুত্রবধুর মধ্যে কে অধিকতর বাঞ্ছনীয়া" ? তাঁরা উপদেশ দিলেন, "স্বগৃহে বিধবা কন্যা এবং শক্রগৃহে বিধবা পুত্রবধু অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

ধরতারি সেন (১৫৬০—১৫৬৮ খৃঃ) : রাণা হীরাসেনকে হত্যা করেন, হীরাসেনের কোন পুত্র ছিলনা ; তাঁর ভাই ছিলেন ধরতারি সেন। রাণা তাঁকে সংবাদ প্রেরণ করেন, যে, হীরা সেন অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা হীরা সেনের পরিজনেরা জেনে গিয়েছিলেন। কীর্তিরাধার রাণা হীরা সেনের শব সৎকারের জন্য তাঁর লোকজনকে পাঠালেন। তাঁরা সকলেই নিহত হলেন—হীরা সেনের রাজ্য থেকে শব সৎকারের জন্য যে সব সমরনিপুণ বীর যোদ্ধারা এসেছিলেন—তাঁদের হাতে। রাণার অনুচরদের শেষ করে—হীরা সেনের শবদাহ সম্পন্ন করে, তাঁরা স্বরাজ্যে ফিরে এলেন। হীরা সেনের ভাই ধরতারি সেন সিংহাসনে আরোহণ করলেন আঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে এবং মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

নরিন্দর সেন (১৫৬৮—১৫৮০ খৃঃ) : ধরিত্রী (ধরত্যারি) সেনের পিতৃব্য নরিন্দর সেন ছিলেন রাজা বন সেনের পুত্র ; তিনি ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

হরজয় সেন (১৫৮০—১৬১২ খৃঃ) : নরিন্দর সেনের জেষ্ঠ পুত্র হরজয় সেন রাজা হলেন ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে। তাঁর প্রজারা তাঁকে 'সৈনী' অর্থাৎ যোদ্ধা বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ৩২ বছর রাজত্ব করে ৫৮ বছর বয়সে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁর দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ দিলবর, কনিষ্ঠ পলাশরাম।

দিলবর সেন (১৬১২—১৬৫৪ খৃঃ) : দিলবর সেনের সময়েই সিকন্দর লোধি মাণ্ডী আক্রমণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে যে পর্ব্বতমালার নামাকরণ হয় তা আজও বিদ্যমান। এই অভিযান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায়, তিনি উমা মাণ্ডীর পথ অতিক্রম করে সাকুন্দ্রা দিয়ে মাণ্ডীতে প্রবেশ করেন। তাঁর আক্রমণের ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। প্রজারা নিরাপত্তার সন্ধানে পর্ব্বতের উপর কেল্লায় চলে আসেন। তিনি এই দেশ ত্যাগ করলেও তাঁর সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ শাখার একাংশ প্রায় নয় বৎসর পর্ব্বতে অবস্থান করে। তাঁদের কিছু উত্তরপুরুষ এখনো সৈনিক বৃত্তিতে নিযুক্ত।

দিলবর সেন ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪২ বছর রাজ্য শাসন করে ৫৭ বছর বয়সে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াত হন। এই সময় বহু ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু তার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়না। তাঁর পুত্র আজবর সেন সিংহাসনে আরোহণ করে সেন বংশের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

আজবর সেন (আজমীর সেন) (১৬৫৪—১৬৮৭ খৃঃ) : আজবর সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁকে প্রজারা 'অজরামর সেন' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এক মন্ত্রী ছিলেন, নাম মধুসূদন,

জাতিতে বিষ্ট-ক্ষত্রিয়। মন্ত্রীর আরও তিন ভাই ছিলেন—যথাক্রমে বামন, পরশুরাম ও বাসুদেব।

একদিন রাজা, মধুসূদনের পরামর্শ চাইলেন, কেমন করে তিনি কানহুবালা, মারাথু এবং গন্ধর্বর রাণাদের রাজ্য অধিকার করতে পারেন। মধুসূদন তখন বললেন, যে তাঁরা চার ভাই, এই চার ভাইকেই তাঁদের পরিজনসহ রাজা যদি নির্বাসন দেন, তবে তাঁরা ঐ রাণাদের দুর্গভেদের পরিকল্পনা করবেন। তদনুসারে রাজা আজবর সেন ঐ চার ভ্রাতার মুখে চুন-কালি মাখিয়ে তাঁদেরকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। তখন তাঁরা গিয়ে গন্ধর্বর রাণার রাজ সভায় উপস্থিত হন। রাণার নাম ছিল গোকুল। তিনি তাঁদের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা তখন বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, যে, রাজা আজবর সেন গন্ধর্বের রাণার রাজ্য আক্রমণ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে তাঁদের পরামর্শ চান। কিন্তু তাঁরা রাণাকে উপদেশ দেন যে, 'গন্ধর্বের রাণা যথেষ্ট শক্তিশালী। রাজা আজবর সেনের পক্ষে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে জয়লাভ করা অসম্ভব। তার ফলে রাজা আজবর সেন ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের নির্বাসিত করেন। এই সব শুনে রাণা গোকুল আনন্দিত হলেন এবং তাঁদের নিজরাজ্যে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। বসবাসের জন্য জমি দেবারও প্রস্তাব করলেন। মধুসূদন তাঁর রাজ্যের প্রান্তে লোকালয়ের বাইরে তাঁর বাসস্থানের জন্য জমি পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁকে লোকালয় থেকে দূরে 'পাথুপট্টম' নামক স্থানে একখণ্ড পাথুরে জমি দেওয়া হল। সেই জমিতে বাসভবন নির্মাণ করে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে রাণা গোকুলকে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁকে বিষাক্ত খাদ্য পরিবেশন করান হয়। তাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় অতর্কিত অক্রমনে অজবর সেন গোকুলকে পরাজিত করে গন্ধর্ব জয় করেন।

মাণ্ডীপর্ব

আজবর সেনের সিংহাসনে আরোহণ (১৬৫৪ খৃঃ)-এর সঙ্গে মাণ্ডীর আধুনিক ইতিহাসের সূত্রপাত। পুরানো মাণ্ডী যা প্রাক্তন রাজধানী ছিল, আজ তা পরিত্যক্ত। বর্তমান 'মাণ্ডী' অধিগৃহীত হয়েছিল সালিয়ানার রাণা গোকুলের সঙ্গে কৌশলও যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। এখানেই সেন রাষ্ট্রের নতুন রাজধানী, যা 'মাণ্ডী' নামেই অভিহিত। প্রাচীন রাজধানীকে 'বাটহোলি' বলা হ'ত। এই নামের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রিলোকনাথ মন্দিরের ১৪৪২ শকাব্দের লেখে অর্থাৎ ১৫২০ খৃষ্টাব্দে। এটি পুরানো মাণ্ডীতে। এর থেকে পরিষ্কার হয় যে, 'নতুন মাণ্ডী' নগরীর পত্তন হওয়ার পূর্বেও মাণ্ডী ছিল। উক্ত নামের ইতিহাস অনুসন্ধানে বিভিন্ন মত এসেছে। শ্রীমতি ফোগেল এবং হাচিসন এটিকে মাণ্ডীর মধ্যে দিয়ে হোশিয়ারপুরে উপনীত হওয়ারও লাদাকের বাণিজ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত একটি বাজার বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এই বাণিজ্য বিনিময়ের কোন পণ্য মাণ্ডীকে স্পর্শ করেনা যে এটিকে একটি 'বিপনি নগরী' বলা যাবে।

মাণ্ডীবাসীরা স্বভাবতঃই এটিকে মাণ্ডব ঋষির নামের সঙ্গে যুক্ত করেন, তিনি দীর্ঘদিন কঠিন তপস্যার দ্বারা পুণ্যলাভ করেছিলেন। এই নগরের নামের সঙ্গে একজন প্রাচীন ঋষিকে যুক্ত করলেও তা এই নগরীর প্রাচীনত্বকে সূচিত করে না।

আজবর সেন এখানে একটি প্রাসাদ এবং চারটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর পত্নী লোকনাথের মন্দিরটি নির্মান করান।

আজবর সেনের রাজত্বকাল কিন্তু শুধু ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়নি। সালিয়ানার রাণা গোকুলের অধীনতা থেকে মাণ্ডী অধিগ্রহণ করা হ'ল এবং তাঁর রাজ্যও অধিকার করে নেওয়া হ'ল, তারপর রাণা গোকুলকে হত্যা করেও আজবর সেনের জিগীষা তৃপ্ত হয়নি। তখনও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ক্ষমতা খর্ব করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। অচিরেই তিনি কানোয়াল ও গন্ধর্বের রাণাদের দমন করে কানোয়াল অধিকার করে নেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কানোয়াল বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে যায়।

গন্ধর্বের কোন রাণার হাতে হীরা সেনের মৃত্যু হয়। এই সকল ঘটনা সমূহ অবাধ্য সমরনায়কদের বিরুদ্ধে আজবর সেনের মনকে বিষিয়ে তুলেছিল। তখন তিনি তাঁর সৈন্য সামন্তদের নিয়ে তেরশ' জনের একটি সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর প্রায় অর্ধেক লোক ছিলেন তীরন্দাজ। তাঁরা বাহলের

কাছে শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করেন ও পরাস্ত করেন। শত্রু সৈন্য পালিয়ে যায়। আজবর সেন যুদ্ধে জয়ী হলেন এবং গন্ধর্বের রাণা নিহত হলেন। রাজা আজবর সেন কামলা এবং খালার জয় করে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আজবর সেনের মন্ত্রী বিষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গেই রাজাকে সকল কাজে সাহায্য করে ছিলেন। আজবর সেন ৩৫ বছর রাজ্য শাসন করেন ও ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

আজবর সেনই মাণ্ডীর প্রথম শাসক এবং সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমগ্র অঞ্চলকে সুগঠিত করেছিলেন এবং রাজ্যের সীমানাকে অন্যান্য অঞ্চল জয় করে বর্ধিত করেছিলেন। তিনি তাঁর উত্তরপুরুষদের রাজধানী উপহার দিয়েছিলের আর প্রজাদের জন্য বিখ্যাত 'ভূতনাথ' ও ত্রিলোকনাথের মন্দির উৎসর্গ করেছিলেন।

সন্তসিংহের মাণ্ডয়ালী ভাষায় লেখা বংশাবলী গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে আজবর সেন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১৪৮৮ বিক্রম সংবতে (১৪৩১ খৃঃ), তিনি ভূতনাথের মন্দির স্থাপন করেছিলেন ১৫১০ সংবতে (১৪৫৩ খৃঃ)। আবার কানোয়ার কাশ্মীর সিংহজীর নিকট প্রাপ্ত বংশাবলীতে দেখি আজবর সেনের মৃত্যু বর্ষ আনুমানিক ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার পর আজবর সেনের পরবর্তী মাণ্ডীরাজাদের ও মাণ্ডীবাসীর ইতিহাস আলোচিত হয়েছে—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

পরিশিষ্ট—ছ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

জাতিভেদ প্রথা প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতা থেকে এসেছিল কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক অভিমত দেওয়া সম্ভব হবে সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার হলে। অনেকে মনে করেন বর্ণবিভাগ সিন্ধুসভ্যতার যুগে কঠোর ছিল না। পাশুপত যোগধর্ম যা সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা অনুসরণ করতেন, তাতে জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। যার ধারা আজও পাশুপত নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও আচরণের মধ্যে দেখা যায়। বৈদিক যুগে ঋগ্বেদে দেখা যায় 'পুরুষ' বা স্রষ্টার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। সেখানেও ব্রাহ্মণের মাথা থেকে এবং শূদ্রের পা থেকে উৎপত্তির মধ্যে উচ্চনীচত্বের ভেদের অপেক্ষা কর্ম বিভাগের ভেদটিই বুঝতে হবে। যাঁরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করবেন, চিন্তন কর্মের জন্যই 'পুরুষের' মস্তক তাঁদের উৎপত্তি স্থল নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার যাঁরা কর্মবীর, তাঁদের জন্য হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়কে উৎপত্তিস্থল বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্গের মতোই প্রত্যেকটি কর্মই প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। কোন একটিকে বাদ দিলে সমাজজীবন অচল হবে।

হিন্দুসমাজ সম্পর্কিত যে তথ্য আমরা ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণগুলি থেকে পাই, সেখানে দেখা যায় যে বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে যে নতুন নতুন বর্ণ জন্ম নেয় তারই বিশেষ স্তরভেদ অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথা ক্রমে জটিলতর হয়ে উঠেছে। যদিও গীতা বর্ণশঙ্করকে ভাল নজরে দেখেননি, কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মনুসংহিতা ও পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রগুলি ঐ বর্ণসঙ্করদের উপেক্ষা না করে তাঁদেরও সমাজে জাতি ও জীবিকার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন।

আর্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও প্রত্যন্তে যে সব জনজাতি ও উপজাতি ছিলেন তাঁরাও আর্যীকরণের ফলে বর্ণাশ্রমধর্মী হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে সে যুগে আর্যরা সে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, তাতে তাঁরা সব জনজাতি ও উপজাতিদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এইসব জনজাতি ও উপজাতিদের মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ব-স্ব কারিগরি বিদ্যা ও কুশলতা অনুযায়ী কাজকর্ম করে সমাজের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে ওঠেন।

হিন্দু সমাজে যাঁরা বহিরাগত তাঁদেরও চতুবর্ণ সমাজের স্তরভেদের মধ্যে গ্রহণ করা হত। এই চতুবর্ণের কাঠামোর মধ্যে দিয়েই হিন্দুসমাজের বিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মী সমাজের মূলস্তরভেদ জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে ক্রমশঃ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। এইভাবে দেখাযায় যে বহির্বাণিজ্যে বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধিলাভের পর বৈশ্যেরা কায়িক পরিশ্রমের কাজ ছেড়ে শুধু মাত্র ব্যবসায়বাণিজ্যে নিজেদের নিয়োগ করে।

দেশি ও বৈদেশিক বিবরণ থেকে জানাযায় যে প্রাচীন ভারতে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে ও বিপননে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভাবে অগ্রসর ছিল। লোকের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়েছিল এবং ভারতের বহি-র্বাণিজ্যের এই সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত রোমের ঐতিহাসিকেরা প্রাচীনকালে আক্ষেপ করে লিখে গেছেন—রোমের সব সোনা ভারত পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দক্ষিণ ভারতের আরিকামেডু প্রভৃতি বন্দরে মাটির নীচে প্রাচীন রোমের যে সব স্বুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে সেগুলি একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের বহির্বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদেয় তেমনি তখনকার বর্ণাশ্রম ধর্মের ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থারও সর্বাঙ্গীন দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় দেয়।

জাতিবর্ণ প্রথার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের হস্তক্ষেপ হয়েছে খুব কম; ভূস্বামী এবং স্থানীয় রাজারাই তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে জাতিগত ব্যবস্থা সঠিক মানা হচ্ছে কিনা নজর রাখতেন। প্রত্যেক জাতির একটি করে পঞ্চায়েত ছিল। আর রাজা বা ভূ-স্বামী ছিলেন তাঁর এলাকাভুক্ত সব জাত পঞ্চায়েতের প্রধান। অর্থাৎ জাতি ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর কর্তৃত্ব বাস্তবে সামাজিক নেতৃত্বে এক স্তর বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ও রাজনৈতিক কতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে জাতসমাজের সভ্যদের একটি পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক (Patron-Client relation ship) গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় রাজারাই কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা এবং কারিগর শ্রেণীর ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এইভাবে একটি সমবায়মূলক অর্থনীতি গঠিত হয়েছিল। জাতিব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গঠিত অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার কোন স্থান ছিল না। যদিও উচ্চবর্ণের আধিপত্য, ছিল, কিন্তু নিজবৃত্তিতে নিযুক্ত থাকলে কারোরই জীবন ধারণের যথাযোগ্য সংস্থানের অভাব ঘটত না। এছাড়া লক্ষণীয় ছিল যে, বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ঘাত—প্রতিঘাতের ফলে বৃত্তি পরিবর্তন একেবারে অসম্ভব ছিলনা।

সংকর জাতির উদ্ভব তত্ত্ব দেখলেও মনে হতে পারে অন্তবর্ণ বিবাহ সমাজে আদরনীয় না হলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। ধর্মীয় নিয়ম কানুন না মেনে কেউ জাতিচ্যুত হলেও স্মৃতিকারদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল তার জন্য। অন্যদিকে একধরণের সামাজিক গতিশীলতা বর্তমান ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের বহুমুখীতা এই গতিশীলতাকে ধরে রাখে। এর জন্য সময় সময় নীচের স্তরের কোন কোনও গোষ্ঠী উপরের স্তরে উঠে এসে স্থান পেয়েছে। বল্লালসেন কান্যকুব্জ থেকে আগত রাঢ় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরিসংখ্যান নেন এবং গুণানুসারে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃষ্টতর তাঁদের কৌলিন্য মর্যাদা দেন। একথা পূর্বেই (পৃষ্ঠা-১৬) আমরা দেখেছি। বারেন্দ্র কুলপঞ্জীমতে তিনি বারেন্দ্রভূমিতে সাড়ে তিনশত ও রাঢ় ভূমিতে সাড়ে চারশত ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু বল্লালসেনের এই কৌলিন্য সম্মান ছিল ঐ ব্রাহ্মণদের ব্যক্তিগত মর্যাদা; বংশগত নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে বল্লালসেন বৈদিক মার্গ ছেড়ে যখন তান্ত্রিক কুলাচার অবলম্বন করেন তখন যাঁরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বল্লালসেন তাঁদেরই মর্যাদা বাড়িয়ে কৌলিন্যের মর্যাদা দেন। পূর্বে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের 'শ্রোত্রিয়' বলা হত। কৌলিন্য মর্যাদা সংস্থাপনের পর 'শ্রোত্রিয়' শব্দটির পুর্ব গৌরব অন্তর্হিত হয়। কিন্তু বল্লালের উত্তর পুরুষেরা কৌলিন্য অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অরিচ্ছন্দ ও ঈর্ষার বিষচ্ছন্দ দেখে ছত্রিশ বছর অন্তর কৌলিন্যের আবার নতুন করে পুনর্নিধারণ করার যে পরিকল্পনা ছিল—তা বাতিল করতে বাধ্য হন এবং কৌলিন্য প্রথাকে বংশগত করে দেন। কয়েক পুরুষ পরে আনুমানিক ১২৮০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র দনৌজা মাধবের সভায় পঞ্চমহাবংশসম্ভূত ছাপ্পান্ন গাঁঞী ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁদের গুণানুসারে কুলীন, সাধ্যশ্রোত্রিয়, সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট-শ্রোত্রিয় এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দেন। আবার আমরা পূর্বে (১৯ পৃঃ) দেখেছি বল্লালসেন কৈবর্তজাতিকে 'জলচল' ঘোষণা করেছিলেন। এতে নিম্নবর্ণের মানুষেরা খুশী হয়েছিলেন। আবার কখনও কখনও বল্লালসেনের মতো রাজারাই 'সুবর্ণ বণিক' ও 'যোগী সম্প্রদায়'কে তাঁদের স্থানচ্যুত করে এইসব প্রজাদের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণেরা বল্লালসেনের পিতৃ-শ্রাদ্ধে দান গ্রহণে অনিচ্ছুক হওয়ায় রাজা তাঁদের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাদিকে জাতিচ্যুত করেছিলেন—গোপালভট্ট ও আনন্দ ভট্ট লিখিত 'বল্লালচরিতম্' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে:

পূর্বস্মাৎ স মহারাজো রুদ্রজান ব্রাহ্মনান প্রতি।
দানত্যাগাদ্বীতরাগঃ স্বপিতৃ শ্রাদ্ধবাসরে ॥

(উত্তরখণ্ডম্ শ্লোক সংখ্যা ২১)

বঙ্গাধিপতি বল্লালসেন সমাজপতিও ছিলেন। সামাজিক অপরাধের বিচার করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন সমাজের কোন কোন মানুষ বা তাঁদের গোষ্ঠীকে 'পতিত' বলে ঘোষণা করেন। তখন তাঁরা অনেকেই নিজেদের জাতি বৃত্তি এমনকি বাসভূমিও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইভাবে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ—যোগী সম্প্রদায়ের অনেকেই সুবর্ণ বণিকদের মতোই দেশত্যাগ করে বল্লালসেনেয় রাজ্যের বাইরে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন ও অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেন, অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে। রাজা বল্লালসেন যোগী পীতাম্বরনাথকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। এই যোগী শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা কিন্তু রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করে নিজেদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে কোন মতেই রাজী না হওয়ায় রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের এই মর্যাদার অহঙ্কার ভাঙ্গতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি প্রকৃষ্ট সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

উপযুক্ত সময় আসে শিবচতুর্দশীর ব্রতের দিন ব্রতোপলক্ষে রাজমহিষী শিব-মন্দিরে পূজার উপচার প্রদান করার পর ঐ মন্দিরের মোহন্ত যোগীরাজ ধর্মগিরির সঙ্গে রাজপুরোহিত বলদেব ভট্টের ঘোরতর বিবাদ বাধে। মোহন্ত কর্তৃক বিতাড়িত রাজপুরোহিত ক্রন্দনরত অবস্থায় রাজার কাছে এসে বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা তখন রুদ্রজ যোগী ব্রাহ্মণদের পাতিত্য বিধান দিয়ে বলেন—"যাঁরা এইসব জাতের লোকেদের সঙ্গে একাসনে বসবে, এদের দান গ্রহণ করবে বা যজন-যাজনাদিতে সাহায্য করবে তারাও সমাজে পতিত হবে। ফলে যোগপট্ট, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ধারণও যোগীদের পক্ষে তখন থেকে অর্থহীন বলে গণ্য করা হয়।"

কারও কারও মনে হতে পারে যে যোগীরাজ ধর্মগিরির ধনরত্নের লোভ ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক স্খলন; রাজপুরোহিতের প্রতি অশোভন আচরণও ব্যক্তিবিশেষের অন্য-এক ব্যক্তির প্রতি আচরিত অপরাধ। কোন একজন মোহন্ত বা ব্যক্তি বিশেষের অপরাধে যে জাতিগত অসম্মানের বোঝা সমস্ত যোগী সম্প্রদায়ের উপর নেমে এসেছিল তার যৌক্তিকতা বিচারের অপেক্ষা রাখে। আবার জনশ্রুতি আছে যে 'বাবা আদম' নামে এক ফকির যোগীরাজ ধর্মগিরির প্রতি এই অন্যায় পাতিত্য বিধানের বিরুদ্ধে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে বল্লালসেনের

সঙ্গে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হন ও যুদ্ধে নিহত হন। 'কাজি-কসবা' নামে একটি জায়গায় তাঁর দেহ সমাহিত হয়েছিল বলে লোকে মনে করে।

বল্লালসেনের রাজত্বকালে সুবর্ণবণিকদের 'পাতিত্য বিধান' বিষয়ে উপরে (পৃষ্ঠা ১৮-১৯) উল্লিখিত ঘটনা ছাড়াও আরেকটি জনশ্রুতি আছে। বল্লালসেন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের সময় দানকার্য উপলক্ষে কিছু স্বর্ণবৃষভ' নির্মান করান ও শ্রাদ্ধ কর্মের বিভিন্ন বিভাগের জন্য ব্রাহ্মণগণকে যৌথভাবে একটি করে সুবর্ণ বৃষভদান করেন। ব্রাহ্মণগণ যৌথভাবে একটি করে স্বর্ণ বৃষভের অধিকারী হওয়ায় সুবর্ণ বৃষভগুলি তাঁরা সুবর্ণ বণিকদের কাছে বিক্রী করে বিনিময়ে সংগৃহীত অর্থ তাঁদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। রাজা বল্লালসেন যখন জানতে পারেন যে সুবর্ণ বণিকেরা ব্রাহ্মণদের কাছে স্বর্ণবৃষভ ক্রয় করে সেগুলি স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে আগুনে গলিয়ে কাজে লাগিয়েছেন তখন রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে স্বর্ণ বণিকদের সমাজে অপাংক্তেয় করেন। তিনি সুবর্ণ বণিকদের পাতিত্যের কারণ নির্দেশ করেন যে শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষভ যেমন অবধ্যও ক্ষত রাখতে হয়, শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত স্বর্ণবৃষভ ও তেমনি অদগ্ধ ও অক্ষত রাখা উচিত ছিল। তা না করে অর্থলোভে রাজার শ্রাদ্ধে দানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত স্বর্ণবৃষভগুলি অগ্নিদগ্ধ করায় তাঁরা রাজার বিবেচনায় লোভও ঘোরতর পাপ করেছেন যার ফলস্বরূপ রাজা তাঁদের বৈশ্য থেকে শূদ্রদের স্তরে নামিয়ে দিয়ে ছিলেন।

রাজা বল্লালসেনের তৎকালীন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে পুরুষানুক্রমে একই স্থানে মানুষ বসবাসকরত সেই অচলায়তন সমাজে 'জাতি কুল'-এর মর্যাদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। সুতরাং তা থেকে কাউকে পতিত করলে সেটা গুরুতর দণ্ড বলে বিবেচিত হত।

তৎকালীন সেন রাজারা রাজা হিসাবে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর অর্থদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদন এমনকি প্রাণদণ্ডের বিধানও দিতেন। তেমনি আবার সমাজপতিরূপে কেউ বর্ণধর্ম বা আশ্রমধর্মের উল্লঙ্ঘন করলে সামাজিক মানমর্যাদার উন্নয়ণ বা অবনয়নের মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়, বা সাম্যাবস্থা ও সুসম আচরণ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলে গোবর্ধনাচার্য, বণিকবধু মাধবীর কাহিনীতে দেখেছি—মধুকর বণিকের বধু মাধবীর শ্লীলতাহানির জন্য রাজা অবশেষে শ্যালক-কুমার দত্তকে প্রাণদণ্ড দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কর্মকুশলতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজের প্রয়োজনানুসারে কর্মের বিভাজন ও তদনুযায়ী জাতিভেদের সৃষ্টি হয়। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ (৪।১৩)। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত ছিল তাকে বলা হত যজমানী প্রথা। সূত্রধার, কর্মকার প্রভৃতির কাছে কৃষিজীবিরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কৃষিজ যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামত করিয়ে নিতেন। এইসব শিল্পী ও কারিগরেরা যেমন সূত্রধার, কর্মকার, কুম্ভকার, প্রভৃতি জাতি কৃষি কার্যকে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাই যে কৃষিজীবিদের যন্ত্রাদি সংস্কার বা অন্যান্য কাজ তাঁরা করতেন, সেই কৃষিজীবিরা তাঁদের নিয়মিত কৃষিজ পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতেন, এবং ভূস্বামী ও জমিদারেরা তাঁদের নগদ পারিশ্রমিকের পরিবর্তে 'চাকরান' জমি দিতেন। যজমানী প্রথায় শিল্পী কারিগরেরা বিশেষ কোন একটি পরিবারের অর্থাৎ 'যজমানের' পরিবারের জন্য বংশপরম্পরায় কাজ করার জন্য নিযুক্ত থাকতেন। সেই 'যজমান' পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অবশ্য নগদ টাকার বিনিময়ে তাঁরা অন্যান্যদের কাজও করতেন। এইভাবে প্রতিটি মানুষ তাঁদের জাতি অনুসারে নির্দিষ্ট পেশা অবলম্বন করতেন। এই প্রথায় দুইটি বর্ণের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক আদান প্রদানের মধ্যে চাকর-মণিব বা কর্মকর্তা-কর্মীর সম্পর্কের মত শ্রেণী সম্পর্ক ছিলনা। এটি ছিল সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বংশ পরম্পরায় কর্ম ও কর্তব্যের অর্থাৎ বর্ণ-ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

নিয়োগ কর্তা (কর্মকর্তা) ও কর্মীর সম্বন্ধের মধ্যে থাকে চুক্তি বা contract কিন্তু প্রাচীন ভারতে শিল্পীর, কারিগরের; পুরোহিতের সঙ্গে তাঁদের যজমানের মধ্যে ছিল 'kintract' বা 'ধর্মভ্রাতৃত্বের' আত্মীয়তার বন্ধন। যারজন্য শিল্পী কারিগরেরা তাঁদের কুশলী হস্ত প্রসারিত করতেন যজমানের কল্যাণ কামনায় নিজ বর্ণধর্মের কর্তব্য পালনে। শিল্পী ও কর্মীর সেই প্রসারিত মঙ্গল হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠেনি 'অহেতুক অবিশ্বাস, সন্দেহে' ও সর্বত্র শোষণের ভূত দেখে। ভারতীয় সমাজের মানুষের পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্কও বিশ্বাসকে ধ্বংস করে সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে ঘরেঘরে বেকার সৃষ্টি হয়নি এ যুগের মতো। কেননা পাশ্চাত্যের হৃদয়বিহীন ভাবধারা তখনও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারেনি।

সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল বর্ণ ধর্ম ও আশ্রম ধর্ম—অর্থাৎ

এককথায় বর্ণাশ্রমধর্ম। ভারতীয় ধর্ম কথাটি যে ইংরাজী religion এর সঙ্গে সমার্থক নয় একথা অনেকে বোঝেননা অজ্ঞতাবশতঃ, আবার অনেকে বুঝেও বুঝতে চাননা। মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জায় অনুষ্ঠিত পূজা-প্রার্থনা ও উপসনামূলক যে ধর্ম তার সম্বন্ধে মানুষ নিরাসক্ত বা secular হতে পারে কিন্তু বর্ণ-ধর্ম ও আশ্রমধর্মের প্রতি নিরাসক্ত হওয়া সম্ভব নয় কেননা তা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে ব্যাপ্ত হয়ে আছে—জীবনের ধারাকে তা ধরে রেখেছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, গুরুকুলে বা বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে যে নিয়মশৃঙ্খলায় অধ্যয়ন ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করতে হয় প্রাচীন যুগের আরুণি, উদ্দালক ও সন্দীপন পাঠশালার কৃষ্ণর্জুনেরা তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এখনকার হোষ্টেলের নিয়মই হ'ল বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীর কাছে প্রাচীন যুগের সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমধর্ম। প্রাচীন যুগের প্রতিটি ছাত্র-ব্রহ্মচারীকে যেমন গুরুগৃহের—আশ্রম ধর্ম পালন করতে অর্থাৎ নিয়ম মানতে হতো বর্তমান কালের প্রতিটি ছাত্রকেও তেমনি হোষ্টেলের সবরকম নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। এগুলি হল বর্তমান আবাসিক ছাত্রের আশ্রম ধর্ম।

তেমনি আবার বর্ণধর্মের ক্ষেত্রে দেখি সমাজের রক্ষী, ক্ষত্রিয়দের বর্ণ-ধর্ম পালনের কাছে তাঁদের রক্ত মাংসের দেহটিও তুচ্ছ হয়ে গেছে। শুধু যে পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যানেই আমরা রাজার জীবনের জন্য বা রাজ্য লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা রাখার জন্য বীরবরের আত্মদানের দৃষ্টান্ত—পাই তাই নয়—'বাংলার সমাজ জীবনে ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনরাজাদের সঙ্গে স্থানীয় লায়েক' (নায়ক), উগ্রক্ষত্রিয় (আগুরি) ও বর্গ ক্ষত্রিয় (বাগ্‌দী) বাঙালী যোদ্ধারাও এ রাজ্য রক্ষণ ও রাজ্যবিস্তারের জন্য আত্মদান করে এসেছেন) তাঁদের এই গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি ১৮ জন তুর্কীর আকস্মিক ও অঘোষিত আক্রমণ। তাই নবদ্বীপের এই তুর্কী আক্রমণ বা পাঞ্জাবে রূপনগরে মুসলিমদের সেনরাজ্য আক্রমণের পরেও সেনরাজ্য নির্মূল হয়নি। হিমাচলের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ সুকেত ও মাণ্ডিতে তা আবার বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং যার ঔজ্জ্বল্য বৃটিশ শাসনের কালেও অম্লান ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর তার মহিমার জ্যোতি যুক্ত হয়েছে ভারত-জ্যোতির সঙ্গে।

ক্ষত্রিয়ের যে বর্ণ-ধর্ম প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে ও বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রকে বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করে চলেছে তাকে হয়তো বর্তমানে ইংরেজী ভাষায় 'আর্মিঞ্যাক্ট' বা 'আর্মি রুলস্' নাম দিয়ে মানা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ বা কোন দেশেরই প্রতিরক্ষা এই বর্ণ-ধর্ম পালনে উদাসীন (বা Secular) হতে পারে না। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা তাই আজও এই বৃহত্তর অর্থে বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম সংরক্ষণে সেন রাজাদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মধ্যযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম সংরক্ষণে সেন রাজাদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—সমাপ্ত—

লেখমালা

বিজয়সেনের প্রস্তর ফলক।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ি থানার দেওপাড়া গ্রামের সন্নিধানে রাজসাহী জেলার ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট্ মেট্‌কাফ্‌ সাহেব একখানি প্রস্তরফলক পান। উহার অক্ষর বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর হইতে পৃথক্। রাজা প্রদ্যুম্নশূর, এই স্থানে প্রদ্যুম্নেশ্বর-নামক হরিহরমূর্ত্তি স্থাপন করেন। বিজয়সেন, এইখানে একটি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন! উমাপতিধর, বিজয়সেনের বংশ ও যশোবর্ণন করিয়া একটি প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। উহার শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমালাচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাতি বীক্ষ্যাননানি
হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

২। লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়োরদ্বৈতলীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো-
র্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ॥

৩। যৎ সিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামর প্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্লফণাঞ্চলশিবশিরঃসন্দানদামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ॥

৪। বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

পরিশিষ্ট

৫। তস্মিন্ সেনান্বায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদামসামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোলোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥

৬। যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটাবিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ॥

৭। গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিং তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ॥

৮। দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।

(*ভূপঃ *সামন্তসেনঃ পাঠান্তরঃ)

যস্মাদদ্যাপ্যবিহিতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

৯। উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরপীতখিন্নবৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥

১০। অচরমপরমাত্মজ্ঞানভ্যাদমা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারান্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ণিক্তভক্ত-
দৃগুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥

১১। মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেহরিকেশাঃ পদভুবিভুজয়োঃ জ্যারমৌর্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য যজ্ঞে সততমিদমিদং রত্নপুষ্পাণি হারা
তাড়ঙ্কং নূপুরং সৎকনকবলয়মপ্যস্য নৃত্যাঙ্গনানাং॥

১২। যদ্দোর্বল্লিবিলাসলব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্বিদীর্ণোরসাং

বীরাণাং রণতীর্থ বৈতরণাদিব্যং বপুর্বিভ্রতাং ।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাপিব মুক্তসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতং ॥

১৩। প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
* * * * কৌশলমভূদানেশ্বরাবভূং ।
শত্রোঃ কোঽপি দধেঽবসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং বুধঃ-
সেকো হারমুপাজহার স্বজ্ঞামঙ্কঃ প্রহারং স্ত্রিয়াং ॥

১৪। মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসারণিস্মেরচরণা ।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রতবিততনিয়োজ্জপদঃ ।
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥

১৫। ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো২-
প্যয়াজিবল শাতনো জগৎকুমারকোলক্রমঃ ।
চতুর্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভর-
বিশিষ্টজয়সাধয়ো বিজয়সেনঃ পৃথ্বীপতিঃ ॥

১৬। গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তানমেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা ।
ইহ জগতি বিষেহে যস্য বংশস্য পূর্ব্ব-
পুরুষ ইতি সুধাংশো কেবলং রাজশব্দঃ ॥

১৭। সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তত্তাদৃশ্যে তুলাং
কিং রামেণ বদামি পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা ।
হেলাং খড্গলতাবতংসিতভুজামাত্রেণ যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলং ॥

১৮ একৈকেন গুণেন বৈ পরিণতস্তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিত্তত্রাপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ ।
যোঽবাঙ্ময়ং তু গুণৈঃ কৃতা বহুভির্ধীমান্ যথান স্থিতো
বৃত্তোনপুরশ্চ চার চ রিপূচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥

১৯। যস্য দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভুতামুর্ব্বীমুর্বীকৃতা
বীরাস্বক লিপিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ ।
সেবাং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
অযাস্তৈকপ্রাণধারিণি গতা ভঙ্গং স্ত্রিয়াং সন্ততিঃ ॥

২০। যং নাস্তবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

২১। শূরং মন্য ইবাসিনীশ্ব কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতনিদ্রাপনোদক্রমঃ॥

২২। পাশ্চাত্যজয়চক্রকেলিষু যস্য যাবদ্
গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌ-বিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্ম পঙ্ক-
মপ্রোজ্‌ঝিতো তরিবিন্দুকলা চকাস্তি॥

২৩। মুক্তাকার্পাসবীজৈর্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবু-
পুষ্পৈরূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকশিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাং॥

২৪। অশ্রান্তবিশ্রাণিতাজ্যযূপস্তম্ভাবলীঃ প্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ ভূবি সঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোপিধর্ম্মঃ।

২৫। মেরোরাহবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় জামিরান্
বাত্যাসংপুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্যস্য চ।
উত্তম্বৈঃ স্বরসদ্মিভিশ্চ বিতটৈঃস্তম্ভৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বপুঃ॥

২৬। দিক্‌শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীপং
ভানোঃ প্রাক্ প্রত্যগদ্রিদ্বিতমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলং।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥

২৭। প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বানিরুদ্ধা মুধা
ভানোস্তাপি কৃতাহস্তি দক্ষিণদিশঃ কোণাস্তবাসী মুনিঃ।
অস্যামুচ্চপথোহয়মুচ্ছতু দিশঃ বিন্ধ্যোহসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে॥

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

২৮। এষা যদি প্রকৃতি ভূমিচক্রে মুমেরুণং পিণ্ডবিবর্ত্তনাত্তিঃ।
অস্যা ঘটঃ তাম্রপাষাণমস্মিন্ স্বর্ণকুম্ভস্য তর্দাপিতস্য ॥

২৯। বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎ কিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ সজলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
স্তনৈণমদসৌরভোচ্ছলিতচঞ্চলীকং সরঃ ॥

৩০। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনার্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাচ্যাশ্চ পুরী শ্মশানবসতের্ভিক্ষ ভুজোঽপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ ॥

৩১। চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মাস্থদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মাকরমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেশস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা-
নেপথ্য * * * সমুচিতবচনং কল্পকাপালিকস্য ॥

৩২। বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কি‍ ‍পি স্বেনৈব তেনে স্থিতং।
কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং
স্বং সাযুজ্য মসাবপশ্চিমশেষে পুনর্দাস্যতি ॥

৩৩। প্রস্তোতুমস্য পরি‍শ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥

৩৪। যাবদ্ বাস্তোষ্পতি সুরধূনী ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাংশ্চোত্তমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তস্য দেবাস্য কীর্ত্তিঃ ॥

৩৫। নির্ণিক্তসেনকুলভূপতিমৌলিকানা-
মগ্রন্থিলগ্রথনশাণ্ডলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধিঃ
যজ্ঞেশ্বরাণতিশয়স্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

৩৬। ধর্ম্মোপনপ্তা মদনাদনপ্তা সুধন্যতঃ সূর্য্যবিমাংপ্রণতিং
চথান বারেন্দ্রকশিরোগামিচূড়ামণীরাণকশূলপাণিঃ ॥

বল্লালসেনকৃত "দানসাগর" লিখিত সেনবংশ।

ছন্দোভিশ্ছেকযদ্ভিঃ শ্রুতিনিয়মগুরুস্তত্রচারিত্রচর্য্যা

মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা ।

সদ্বৃত্তস্বচ্ছবংশো জলপুরুষগুণাচ্ছিন্নসন্তানধারা

বন্দ্যোর্মূর্ত্তামযশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ ॥

তত্রালঙ্কৃতসৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং

স্বচ্ছন্দপ্রণয়োপভোগসফলভকল্পদ্রুমো অক্ষয়ঃ ।

হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্থ নৈসর্গিকৈ

রুদ্গীতস্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি ।

অস্মাদ্বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো

দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং ।

শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ

প্রণতিপরিগৃহীতাঃ প্রাংশবো রাজবংশাঃ ॥

সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্ পচিতশ্রীদানবানাং ঘনৈ-

রাসারৈরভিষিক্তনির্ম্মলযশঃ শালেয়ভূমণ্ডলং ।

দৈত্যোত্তাপভৃতামকালজলদসর্ব্বোত্তরস্মাভৃত্রাং

শ্রীবল্লালনৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাবগর্ব্বেশ্বরঃ ॥

বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে

নিত্যব্রাহ্মণবীচিলাসনন্দনঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি ।

ষট্কর্ম্মাম্বরবাধ্যশীলমলয়ঃ প্রখ্যাতসত্যব্রতো

কৃত্বাবেদবি শ্রীপতির্নৃপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ ॥

বিদ্বৎসভা-কমলিনীরাজহংসেন ভূভুজা ।

শ্রীমদ্বল্লালসেনেন কৃতোঽয়ং "দানসাগরঃ" ॥

লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপন দীঘীর নিকটবর্ত্তী স্থানে, পুষ্করিণী-খনন-কালে, এই তাম্রশাসন খানি পাওয়া গিয়াছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

বিদ্যুদ্যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দাম্বুদঃ ।।১।।
আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোঽহমেবেতিধীঃ ।
যস্যাসৌ অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ত্যাপ্তপ্রকাশাজ্জগ
ত্যাত্রের্ধ্যানপরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ।।২।।
সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
রম্ভোরুহৎ পদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ ।
তেজো বিধজ্জর মুখো দ্বিষতামভূবণ
ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে ।।৩।।
আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনগ্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্ ।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৈকপুণ্যাবলী
শালিগ্রামবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্ বংশজঃ ।।৪।।
যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ-
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধা ইব দিশঃ ।
ততঃ কাঞ্চীলীলা চতুরচতুরম্ভোধিলহরী
পরীতোর্বীভর্তাজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী । ৫।।
প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদার্থনৈকাধ্বগঃ
সংগ্রামশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্ বল্লালসেনস্ততঃ ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী দত্তৌষধাং তৎক্ষণা-
ল্লক্ষ্মীণামরচারুকায় বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ।৬।।
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিতস্তৎপ্রভাবস্ফুটঃ ।
দোর্দণ্ডপ্রতিবিম্বসঙ্গরযশো রাজন্যধর্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সোজস্বসীমাজনি ।।৭।।
শবদ্ বক্তাদ্ বিমুক্তবিষমাস্ত্রমাত্রনিষ্ঠিক্ত-
ধারাধারা কথং নমায রিপবস্তস্য প্রয়োগাজয়ন্ ।

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

বৈরাজ্যপ্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ পত্রেঽপি চক্রং ভুবে-
ইত্যাদৌত্রে রতন্মতেঽপি সপরো দৈবঃ পরং বীক্ষ্যতে ॥৮॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজশ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপগতা-শেষরাজ-রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভৌরিক-মহা পীলুপতি-মহাগণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক-গৌল্-মিকদণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহা-কীর্ত্তিতান্ চট্ট-ভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতানিকরদেয়াস্মণ ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তত্রত্য দেশব্যবহারনলিন-দেব গোপমাণ্ডসারতুবহিঃ পঞ্চোন্মানাধিক-বিংশত্যুত্তরাঢ়বাপশতৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দক-পুরাণসার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো বিল্লহিষ্টীগ্রামীয়ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়োঽচট্ট-ভট্টপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য তৃণ-পূতি-গোচরপর্য্যন্তঃ হুতাশনদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজসগোত্রায় ভরদ্বাজ-আঙ্গিরস বার্হস্পত্যপ্রবরায় সামবেদকৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথমহাদানাচার্য্য-শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণ-ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎ-সৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্-ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে। নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম-গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ

শ্লোকাঃ। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সাগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং ॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
ইতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥

শ্রীলক্ষ্মণসেনো নারায়ণদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং।
ইহ ঈশ্বরশাসনে দূতং বাধত্তু নরনাথঃ। সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩॥ শ্রী

সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসন খানি, কলিকাতার দক্ষিণস্থ জয়নগর গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী, সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত হন। ইহার প্রথম সাতটি শ্লোক, দিনাজপুরের তাম্রশাসনের অবিকল অনুরূপ; কেবল ইহাতে অষ্টম শ্লোকটি নাই।

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুপগত প্রতীর্থ্য রাজ-রাজন্যক রাজ্ঞী রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার-মহাভৌরিক মহাপীলুপতি-মহাগণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষ্যা-জীবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্ট-ভট্ট-জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্-ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্তু ভবতাং। যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিনি খাড়ীমণ্ডলিকান্তঃপুরচতুরকে পূর্ব্বেশান্ত্যশাবিক প্রভাশাসনং সীমা দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা পশ্চিমে শান্ত্যশাবিকরামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বসীমা উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশবগড়োলীভূমিসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নশ্রীমদ্গ্রমাধবপাদীয়নলাঙ্কিত-দ্বাদশাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্তপরিমিতাম্মানেনাধস্ত্রয়া সার্দ্ধকাকিনী দ্ব্যাধিক ত্রয়োবিংশত্যুন্মানোত্তর-খারবকসমেতভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোৎপত্তিকঃ স বাস্তুচিহ্নমেতল্গ্রামীয়কিয়ানপি ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থল-সগর্ত্তোষর-সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পারহৃতসর্ব্বপীড়োঽচ চট্ট ভট্ট প্রবেশোঽকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যস্তৃণযূতিগোচরপর্য্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গসগোত্রায় অঙ্গিরা-বৃহস্পতিশিনিগার্গ্যভরদ্বাজপ্রবরায় ঋগ্‌বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীধরদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীনারায়ণ ভট্টারমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবভিরপি নৃপতিভিরপহরণেনরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ

বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যস্তু ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
ইতি কমলাদলাম্বুবিন্দুলোলামিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণীভাতুঃসন্ধিবিগ্রহিকেশবিপ্রবাধিপ্রায়ক্ষরাং কৃষ্ণ ধরাস্তাভ শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘদিনে ১৩ মানে মতাসাতিঃ ॥

আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

লক্ষ্মণসেনের নিম্নলিখিত তাম্রশাসন, রাণাঘাটের নিকট আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম। ইহার অক্ষর দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী।

ইহার প্রথম সাতটি শ্লোক, দিনাজপুরের তাম্রশাসনের অনুরূপ, কেবল ইহাতে আরও তিনটি শ্লোক অধিক আছে।

আম্নায়ঃ প্রণিনায় যানি মুনয়ঃ যান্যস্মরন্ সংস্তুতা-
ন্যাচারেষু যানি তানি দধিরে দানানি দৈন্যচ্ছিদা।
ক্ষীণস্বেব তথাপ্যনেন নিয়মং কালেষ্বসংখ্যাততা-
দেবেষ্বক্রিয়মন্তরেণ ফলাশংসাং বিধৌ শৃণ্বতা ॥
সময়মপি সমুদ্ধতং সুমন্তং তদপি মহৌষধমুদ্বভুব যত্র।
ভবতি পরপুর প্রবেশসিদ্ধিঃ করবিধৃতিঃ সকৃদেব যস্য মূলে ॥
যান্ * * জগত্রয়ী বিজয়েন মিত্রৈর্বিনির্বারিতো-
বৈঃ সক্ষয়ান গঙ্গয়া কনকপিস্বর্গোঽপি সংবর্দ্ধ্যতে ॥
তামুচ্চৈর ভগান্নিশালিবসুধানা রামরম্যান্তরাং
বিপ্রেভ্যোঽয়মদত্তপঙ্কজাননান্ ভূমীপতির্ভূয়সঃ ॥

স খলু বিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লালসেনদেবপাদানু ধ্যাত-পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপগতাশেষরাজরাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসন্ধি-বিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার-মহাভৌ গিকমহাপীলুপতি-মহাগণস্থদোসসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষা জাবিকাদিব্যাপৃতক

গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীনন্যাংশ্চ-সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারো ক্তোনিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভবতাং। যথা—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিব্যাঘ্রতট্যাং পূর্ব্বে অশ্বথবৃক্ষঃ সীমা। দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপশাসন সীমা। উত্তরে মালামঞ্চবাপী সীমা। ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নং বৃষভশঙ্করনলিন স কাকিনীকসপ্তত্রিংশ-দুন্মানাধিকা-ঢাবাপনবদ্রোণোত্তরভূপায় কৈকাত্মকং সংবৎসরেণ কপর্দ্দপুরাণশতিকোৎপত্তিকং মাধবগ্রিয়া খণ্ডক্ষেত্রং সসাটবিটপং সজলস্থলং সগর্ত্তোষরং সগুবাকনারিকেলং সহদশাপরাধং পরিহৃতসর্ব্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশং অকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্য তৃণ-যূতিগোচরপর্য্যন্তং বিপ্রদাসদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শঙ্করদেবশর্ম্মণং পৌত্রায় দেবদাসশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিকসগোত্রায় বিশ্বামিত্রবন্ধুল-কৌশিকপ্রবরায় যজুর্ব্বেদকাথশাখাধ্যায়িনে পণ্ডিতশ্রীরঘুদেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তমস্মাভিঃ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদামুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো
বিলোপ্যাঃ॥

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবো নারায়ণদত্তসান্ধিবিগ্রহিকং রঘুদেবশাসনে কৃতদূতং ভূমণ্ডলবলভিৎ॥
সং ৬ভাদ্রদিনে ৯ মহাসাংনি. শ্রীনি।

মাধাইনগরের তাম্রশাসন।

পাঠ ১ম পৃষ্ঠা।

ওঁ নমো নারায়ণায়॥

(১)
বক্ষ্যাকে শবরবধূদোরসি তড়িম্নেথব গৌরী প্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিংসমাশ্রি

হিমাচলে লক্ষণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

(২)　　　　　　　　　　তমভূদ্ স্থাণ্বিচিত্রং বপুঃ।

দীপ্তার্কত্যাতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং

দেবত্রাসনিরস্তদানব *

(৩)　　　　　　　　গজঃ পুরাত্তু পঞ্চাননঃ ॥ (১)

স্বর্গঙ্গাজলপুণ্ডরী কমম্বুপ্রাধারাগৃহং

শৃঙ্গারক্রমপুষ্পমীশ্বরশি

(৪)　　　　　　　　খালঙ্কারমুক্তামণিঃ।

ক্ষীরাম্ভোনিধিজীবিত (৺) কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসকো

জীয়ান্মন্মথরাজপৌষ্টি

(৫)　　　　　　　কমহাপাষ্টিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ ॥ (২

ত্রিভুবনজয়সজ্ঞ, ভাবকল্পৈঃ ক্রতুভিরবাধিতসন্নিনাহমরাণাং।

অজনিষত

(৬)　তদন্বয়ে ধরিত্রীবলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়া নরেন্দ্রাঃ ॥ (৩)

পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য

(৭)　　　　　　　　　　বংশে

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্তপ্যতা না

(৮)　　　　　　　　　　কনস্থাং

নির্ম্মুক্তো যেন যুধ্যত্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধার কৃপাণঃ ॥ (৪)

বীরাণামধিদৈবতং রিপুচমূমারা

(৯)　　　　　　　　　　　ক্ষমজক্র

স্তস্মাদ্বিস্ময়নীয়শৌর্যমহিমা হেমন্তসেনোঽভবৎ।

ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদেব্যা

(১০)　　　　　　　　　যদীয়ং যশো

বস্তস্যেব সুমেরুমৌলিমিলিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥ (৫)

অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশির

(১১)　　　　　　　　　স্মাৎ

সমর বিস্ময়রাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ।

ইহ জগতি বিবেক্তে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ

পুরুষ ইতি সুধাংশো

---

* শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে "দেবত্রাসং-নিরস্তদানবঃ" পাঠ হইবে।

(১২) কেবলং রাজশব্দঃ। (৭)

ভূচক্রং কিয়দেতদাবৃতমভূত্তন্নামনত্যাজ্ঞিণা

নাগানাং কিয়দান্তদর্পনুর

(১৩) সালশ্যান্তি গূঢ় জুম্ভঃ (?)

একাহান্তদনুকুরুকতি কিয়ন্মাত্রস্তদপ্যম্বরং যস্যাতীব যশোস্ত্রিয়া ত্রিভুব

(১৪) নব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি। (৭)

অস্মাদশেষভুবনোৎসবকারণেন্দুর্বল্লালসেনজগতীপতিরুজ্জগাম। যঃ

(১৫) কেবলং ন খলু সর্বনরেশ্বরাণামেকঃ সমগ্রবিবুধামপি চক্রবর্ত্তী। (৮)

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচা

(১৬) লুক্যভূপালকুলেন্দুরেখা।

তস্য প্রিয়া ভূবহমানভূমির্জ্যাপৃথিব্যোরপি রামদেবী। (৯)

(১৭) বসুদেবদেবকসুতাদেহান্তরাভ্যামিব

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনমূর্ত্তিরজনি শ্রাপালনারায়ণঃ।

(১৮) যস্যায় জন্ম নিঃসহমিলস্থিতানুষচ্চকলাত্

কুটৈনাধি···ধিক···কমি ··। (১০)

(১৯) স্যাদ্ গৌড়েশ্বর শ্রী হটহবণ (?) কর্ম্ম যস্য কৌমারকেলিঃ কলিঙ্গেনাঙ্গনাভি···

(২০) যে যস্যপূর্ব্বঃ। যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতো যস্য ··ধারাতীর···পা ·· স্তুতি···

(২১) শ্চরণজরজসা নির্ম্মমে কার্ম্মণানি। (১১)

আকৌমারং সমরকৃতি···

(২২) মিব দিশামীশিতাস্তে বিমুক্তাঃ। হ···বপুর্ব্বিকলয় (?)

তস্য জিষ্ণৌ প্রবিষ্টাঃ··· ···

(২৩) ত্র হি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ। (১২)

যত্রারামক্রমদলরুচা শৈবাল... ··· ···

(২৪) পুবো সঙ্কিতা ভূঃ। প্রাণান্ মুক্তস্তাবনিপতয়ো··· ···

. ··· । (১৩)

(২৫) ···নির্গতে খলু ধাধ্যগ্রামপরিসরসমাবাসিত শ্রীমহারাজাধিরাজ···

(২৬) পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত

(২৭)

(২৮)

(২৯)

২য় পৃষ্ঠা।

(৩০) বিক্রমস্য বীরচক্রবর্ত্তি সার্ব্বভৌম… …সোমবংশ প্রদীপ রাজ-
প্রতাপনারায়ণপরম

(৩১) দীক্ষিতপরমব্রহ্মক্ষত্রিয়স্যৈক … …
ক্রীড়াবধূতমশেষকেলিবিকলীকৃতক

(৩২) লক্ষ বিক্রমবশীকৃতকামরূ (পা) বনীমণ্ডলৈকচক্রবর্ত্তি গৌড়েশ্বরপরমে

(৩৩) শ্বরপরমনারসিংহপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ সমু

(৩৪) পাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্ররাজামাত্য
মহাপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসান্ধি

(৩৫) বিগ্রহিকমহাসেনাপতিমহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ
বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিকমহাপ্রতীহার

(৩৬) মহাভোগিকমহাপিলুপতিমহাগণস্থ দৌঃসাধিক
চৌরোদ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজা

(৩৭) বিকাদিব্যাপৃতকগৌল্মিকদণ্ডপাশিকদণ্ডনায়ক বিষয়
পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজী

(৩৮) বিনোহধ্যক্ষ প্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্
জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রা

(৩৯) হ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তি সমাদিশন্তি চ
মতমস্তু ভবতাম্। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনভু

(৪০) ক্ত্যন্তঃপাতিবরেন্দ্র্যাং কান্তাপুরাবৃত্তৌ রাবণসরসি নিম্নানে
পূর্ব্বে চডস্পসাপাটকপশ্চিমভূঃ সীমা

(৪১) দক্ষিণে গয়নগর উত্তরভূঃসীমা পশ্চিমে গুণ্ডীস্থিরাপাটক
পূর্ব্বভূঃ সীমা উত্তরে গুণ্ডীদাপণিয়াদ

(৪২) ক্ষিণভূঃসীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নগোযবগোচারাস্তস্য
চ দেবব্রাহ্মণপাল্য ভব'ন্তঃ এক

(৪৩) নবতিপাড়িকাধিকভূখাড়ীশতৈকাত্মকসংবৎসরেণ
কপর্দ্দকাষ্টষষ্টিপুরাণাধিকশতমূল্যকাধিকো দাপণিয়া

(৪৪) পাটকঃ। সসাটবিটপঃ সজলস্থলঃ
সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেল সহ দ

(৪৫) (শাপরাধ পরি) হৃত সর্ব্বপীড়োহচট্টভট্টপ্রবেশঃ (অ)
কিঞ্চিত্‌ প্রগ্রাহ্যতৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তঃ য।

(৪৬) (যোদয়) দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় শ্রীরামদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
কুমারদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় কৌশিক

(৪৭) সগোত্রায় • • • প্রবরায় অথর্ব্ববেদ
পৈপ্পলাদশাখাধ্যায়িনে নাঙ্গাশাবিক

(৪৮) শ্রীগোবিন্দদেবশর্ম্মণে বিধিবদুদ(ক)পূর্ব্বকং ভগবন্তং
শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য

(৪৯) মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে সপ্তবিংশত্রাব
দিবসে…পূর্ব্বকমূলাভিষেকঃ

(৫০) …ঐন্দ্র্যা মহাশান্তি · ·· · · তগন্তি · ·
… শিকাদি … উচ্ছ্‌ত্যাচন্দ্রার্কক্ষিতি

(৫১) সমকালং যা (বত্‌ভূমিচ্ছিদ্র) ন্যায়েন প্রদত্তোঽস্মাভিঃ
তদ্‌ ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবাহুমন্ত

(৫২) ব্যং ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াত্‌
পালনে ধর্ম্মগৌরবাত্‌ পালনীয়ং। ভবন্তি

(৫৩) চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ
ভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মা

(৫৪) (ণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা)
রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি

(৫৫) স্তস্যতস্যতদা ফলং। (আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ)
ভূমিদোহস্মত্‌ কুলে জাতস্ স ন

(৫৬) স্ত্রাতা ভবিষ্যতি (।)… … … … …

(৫৭) … … … … … … …

(৫৮) … … … … … … …

কেশব সেন দেবের তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসনখানি, বাকরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর পরগণায়, এক কৃষক প্রাপ্ত হইয়াছিল। (কেশব সেনের কি বিশ্বরূপসেনের দত্ত, তদ্‌বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে।)

হিমাচলে লক্ষ্মণ সেনের উত্তর পুরুষেরা

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারানিবন্ধভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তং ।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুগ্ধস্বমদ্ভুতখগং নিগমক্রমস্য ॥ ১ ॥
পর্য্যস্তস্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বগ্বিমুগ্ধীভবন্
মুক্তাকুণ্ডলমণ্ডিমম্বরনদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ ।
উদ্ভিন্নস্মিতমঞ্জরীঃ পরিচিতা দিক্‌কামিনাকল্পয়ন্
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়কযশো জন্মান্তরশ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২ ॥
এতস্মাৎ ক্ষিতিভারনিঃসহশিরো দর্ব্বীকরগ্রামণী
বিশ্রামোৎসবদানদীক্ষিতভুজাস্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে ।
যেষাম প্রতিমল্লবিক্রমকথারব্ধপ্রবন্ধাদ্ভুত-
ব্যাখ্যানন্দবিনিদ্রা সান্দ্রপুলকৈর্ব্যাপ্তা সমস্তৈর্দিশঃ ॥ ৩ ॥
অবান্তরপথান্বয়ে মহতি তত্রদেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া ।
যদঙ্ঘ্রিনখধোরণি স্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজাং
দশাস্তনতিবিভ্রমং   *   *   কেলিবিক্রমঃ ॥ ৪ ॥
নীলাম্ভোরুহসোদরোঽপি দলয়ন্ মর্ম্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোঽপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপস্নিগ্ধোঽপি তন্বন্ ভয়ং ।
নির্নিক্তাঞ্জন সন্নিভোঽপি জনয়ন্ নেত্রক্রমং বৈরিণাং
যস্যাশেষজনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি ॥ ৫ ॥
ভাস্বন্নিস্ত্রিংশনিদ্রাবিরহবিলসিতৈর্বৈরিভূপাল বংশা-
মুচ্ছিদ্যোচ্ছিন্ন মূলাবধিভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ ।
আসীত্তেজো জিগীষা সহদিবস করেণৈব দোশ্চরলাভ্
দুর্ভৈরবাসী বিবাদামজনি দিগধিপৈরেব সাযোবিবাদঃ ॥ ৬ ॥
খেলৎখড়্গলতাপমার্জ্জনহৃত প্রত্যর্থিদর্পজ্বর-
স্তস্মাদ প্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্ বল্লাল সেনো নৃপঃ ।
যস্যায়োধনসীম্নি শোণিতসরিদ্বঃ সঞ্চারায়াং হৃতাঃ
সংসক্তদ্বিপরন্তদণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥
শ্রীকান্তোঽপি নমায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্যক্ষয়ং
বক্তুং নেত্রাপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্তদোষাগ্রহঃ ।
ভোগীন্দ্রোঽপি ন জিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্যবেশাদ্ভুত-
গুণারম্ভণেন নৃপতিরদ্ভুতলোকলক্ষ্মঃ ॥ ৮ ॥

প্রত্যূষে নিগড়স্বনৈর্নিয়মিত প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরভপ্রোদ্গোল ঘণ্টারবৈঃ।
সায়ংবেশবিলাসিনীজন রণন মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈ-
র্যেনাকারি বিভিন্নশব্দঘটনা বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ ॥ ৯ ॥
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যকৃতা ব্রতো-
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ ॥ ১০ ॥
ন গগনতল এব শীতরশ্মির্ন কনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজি ॥ ১১ ॥
বাহুর্বারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাজন প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বহুধা চক্রেঽস্বরূপো রিপুঃ ॥ ১২ ॥
বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি ॥ ১৩ ॥
যাং নির্মায় পবিত্রপাণিরভবদ্ বেধাঃ সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপচরিতৈর্বিশ্বং যয়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাহিতানি বিদধে যস্যাঃ সপত্ন্যৌ মহা
রাজ্ঞী শ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সা ভূত্রিবর্গোচিতা ॥ ১৪ ॥
এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ ;
শ্রীকেশবসেনদেবোঽপ্রতিমভূপাল মুকুটমণিঃ ॥ ১৫ ॥
দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাং পয়ঃ
পাত্রেষ্বেহিমযৈর্হিরণ্যপদবী প্রাপ্তাঽপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থিপৃথ্বীভুজাং
যৎপাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্ধাতোর্দ্বয়োর্বর্ণতাং ॥ ১৬ ॥
আকৌমারমপারসঙ্গরভরব্যাপারভূষাবশ-
প্রাপ্তস্যাস্য নিশম্য ধীরপরিষদ্ বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।

নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতিভূপনিবহৈর্য্যাখ্যায়তেবাত্মতে ॥ ১৭ ॥
আকর্ণাকলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানান্তঃ কর্ণগর্ব্বদর্পকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং ।
নীবীবন্ধবিসারণৈঃ পরিষদিত্রস্তং মৃগাক্ষীদৃশা
যস্যাপ্যারম্ভযোষিতং কথমপি প্রাপ্তোহিতৈনেতৎকরঃ ॥ ১৮ ॥
তাপিচ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সান্দ্রতাং কচ্ছস্থলীনীরদৈ-
নীরন্ধ্রেব নভস্তটীমরকতৈঃ কৃষ্ণা ভুবঃ স্মারকঃ ।
নীলগ্রীবকদম্বকৈরবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসায় যজ্ঞহুতভুগ্ধূমাবলী খেলতি ॥ ১৯ ॥
কল্পাঙ্কহকাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্ বিতাগাঙ্কিতে
রম্যানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রেয়সালসা ।
এতৎপাদপয়োধরপ্রণয়িনীচ্ছায়া বিতানাঙ্কলে
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিত্রবিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥
কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিতলোকপালাবলী
বিলোকিতবিশৃঙ্খল প্রধনজৈত্রযাত্রাভরঃ ।
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণী
স গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ ॥ ২১ ॥
পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্ত্রয়ে ।
সরস্বত্যাপিতাং লেভে যদাননকৃতালয়া ॥ ২২ ॥
আকল্পাভ্রংলিহ গৃহশিখামন্ত সৌন্দর্য্যরেখাং
পশ্যন্তীভিঃ পুরোবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ ।
বার্ত্তাকৃষ্টৈর্নয়নচলিতৈর্বিস্ময়ং বর্ণয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিতপ্রেমবন্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ২৩ ॥
এতেরোমভবেগসঙ্কটভুবঃ স্রোতস্বতীসৈকত
ক্রীড়া লোলমরালকোমলকণৎ কাণপ্রবীতোৎসবাঃ ।
বিপ্রত্যো দধিরে মহীমঘবতানেক প্রতিষ্ঠাভৃতঃ
পাকপ্রক্রমশালিশালিসরলক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ ॥ ২৪ ॥

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসরশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্তসুপ্রশস্তোপেতঅরিরাজবৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বরশ্রীমদ্বিজয়সেনদেবপাদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্তোপেতঅরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনপাদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্তোপেত-অশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজত্রয়াধিপতি সেন-

হিমাচলে দক্ষ সেনের উত্তর পুরুষেরা

সুজনকমলবিকাশ ভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নদানকর্ণসত্যব্রতগাঙ্গেয় শরণাগতবজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌরমহারাজাধিরাজ অরিরাজবাতুকশঙ্করগৌড়েশ্বরশ্রীমৎ সনদেবপাদাবিজয়িঃ সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্যমহাপুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহাসৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-নিয়োগপত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রবরাংশ্চ চট্ট-ভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। বিদিতমস্ত ভবতাং। যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিবঙ্গে বিক্রমপুরভাগপ্রদেশে প্রশস্তলভাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বে সত্রকাধিগ্রামসীমা দক্ষিণে শঙ্করবসা গোবিন্দবসাকঃ ভূঃসীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপা-সাদাস্থ্যসন্নগ্রামসীমা উত্তরে বাগুলীকিসাভাবত্ত মানভূঃ সীমা ইত্থং যথা প্রসিদ্ধসীমা-বচ্ছিন্নবৃহন্নপতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্কামনয়া সমুৎসর্গিতা সজ্জায়োৎপত্তিকা সাচভূমিঃ সগর্ত্তোষরা সজলস্থলাখলপলাশগুবাকনারিকেলা চণ্ডচণ্ডপ্রবেশাবর্জ্জিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ দিনং ত্বৎ সজলনানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক-নারিকেলাদিকং সংগৃহিত্বা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপভোগেনোপভোক্তুং বাৎস্যসগোত্রস্য ভার্গবচ্যবনআপ্লুবৎঔর্ব্বজামদগ্ন্যপঞ্চপ্রবরস্য পরাশরবাৎস্যসগোত্রস্য তথা পঞ্চপ্রবরস্য বনমালীদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্যগোত্রায় ভার্গবচ্যবনআপ্লুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় প্রতিপাঠকায় শ্রীঈশ্বরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিবমুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ডচণ্ডদণ্ডাভাবশাসনীকৃত্য প্রদত্তা যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্নশাসন-ভূর্মিহি। ৩০০। বহুভবিভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎপালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং ভবতি চাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ শ্লোকাঃ।

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদোঽস্মৎকুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ।
সর্ব্বেষামেব দানানামেকজন্মানুগং ফলং।

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ।
সচিবশতমৌলিলালিতপদাম্বুজস্ত্যানুশাসনভূতঃ শ্রীবুতদত্তোদ্ভবগৌড় মহাভট্টকঃ
খ্যাতঃ শ্রীমৎমহুসাকরণনি শ্রীমহামদনককরণনি শ্রীমৎকরণনি সং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে।

শ্রীবিশ্বরূপ সেনদেবের তাম্রশাসন।

ইহার প্রশস্তি শ্লোকগুলি কেশবসেনের তাম্র শাসনের অনুরূপ। কেবল ইহাতে ১২শ, ১৭শ, ১৮শ এবং ১৯শ শ্লোক কয়টি নাই, এবং ১০ম শ্লোকের "বিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ স্থানে বিশ্বরূপো নৃপঃ" এইরূপ পাঠ হইবে।

ইহ খলু স্কন্ধগ্রাম পরিসর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ সমস্তসুপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজবৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বিজয়সেন দেব-পাদানুধ্যাত সমস্ত সুপ্রশস্ত্যাপেত অরিরাজ-নিঃশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বল্লালসেন দেব-পাদানুধ্যাতসমস্তসুপ্রশস্ত্যাপেত অশ্বপতি গজপতি-নরপতি-রাজ্য-ত্রয়াধিপতিসেন-কুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রতগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র-পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌর-মহারাজাধিরাজঅরিরাজমদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদানুধ্যাত-অশ্বপতিগজপতিরাজত্রয়াধিপতি সেনকুলকমলবিকাশ-ভাস্করসোমবংশ প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণসত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরমভট্টারক-পরমসৌর-বিজয়িনঃ। মহারাজা ধিরাজ-অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিশ্বরূপ-সেনাপাদা সমুপাগতাশেষরাজ রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবল-হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ড-নায়ক-বিষয় পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়ন্তি বোধয়ন্তিসমাদিশন্তি চ বিদিতমস্তু ভবতাং যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগগ্রাম জজালভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রামভূঃসীম পশ্চিমে উঙ্কোকাপ্নী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপ্নী-জজালসীমা ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোঞ্জীকাপ্নীগ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পা শঙ্করা সমীপপদা-তিয়ধামার্ক·· ক্ষিতিংশতপুরাণোত্তর চ (তু) স্ত্রিংশতিক ১:৪ যড়িঃ সীভূহি ৬০০ তথা কন্দর্প শঙ্করাশ ভূমৌ নারাস্তর্প গ্রামে··· ··· দ্বাভ্যাং স পুণ্ড্যোতি পুরাণাধিকসংছিন্না-ষট্‌শতিকাপত্তিকপোঞ্জিকাপ্নী গ্রামঃ সজলস্থলঃ সগাটবিটপঃ সোষরঃ সগুবাকনারিকেল-তৃণবৃতি পূর্ব্বান্ত-উপরোল্লিখিত চতুঃ সি (সী) মাবচ্ছিন্নপোঞ্জী·· গ্রামোয় (২) শিব-পুরাণোক্ত-ভূমিদান-ফল-প্রাপ্তিকামনয়া বৎসসগোত্রস্যভার্গব চ্যবন-আপ্লুবত ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্যপ্রবরস্য পরাশরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গবচ্যবন-আপ্লুবত-

জামদগ্ন্য-প্রবরস্য গর্ব্বেশ্বরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বৎসসগোত্রস্য ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবত-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্য-প্রবরস্য বনমালিদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বৎসসগোত্রায় ভার্গব-চ্যবন-আপ্নুবত-ঔর্ব্ব-জামদগ্ন্যপ্রবরায় প্রতিপাঠকায় শ্রীবিশ্বরূপদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বিধিবদ্ (উ) ৎ সৃজ্য শ্রীসদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন চতুর্দ্দশাব্দীয় তাম্রদিনে তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। অত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সাং শাসনভূমি ৫৪৭ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপিনৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনেধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ। ভূমিদোঽস্মৎকুলেজাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্যতস্যতদাফলং॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্। স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়োবিলোপ্যাঃ। সচিব-শতমৌলিলালিত পদাম্বুজস্যানুশাসনতূতঃ। শ্রীকোপিবিষ্ণুরভবৎ গৌড়মহাসান্ধিবিগ্রহিকঃ শ্রীমন্মহাসাং করণনি। শ্রীমহামত্তক করণনি। শ্রীমৎকরণনি॥ সং ১৯ আশ্বিন দিনে ১॥

॥ সম্পূর্ণ ॥

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিতং দুর্গাপূজাতত্ত্বম্

The treatise on the worship of Goddess Durgā (the *Durga Puja-tatvam)* by Raghunandan Bhattāchārya. (The last page)

শ্রীঅনঙ্গ কবিরাজ কৃত বৈদ্যকল্পতরু

A Comprehensive treatise for Medical Practitioners (*Vaidya Kalpataru*) by Shri Ananga Kaviraja (The last page of the chapter on poison *viṣādhikaraḥ*)

শ্রী গোপাল ভট্ট বিরচিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাস নাম গ্রন্থঃ

A devotional book *Sri Bhagavadbhaktibilasa* by Sri Gopal Bhatta (The last page).